গিয়েও তুমি যাওনি চলে আছ মোদের কাছে,
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কায়া তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের উন্নতি হোক তোমার আশীষ নিয়ে।

স্বামীতীর্থ

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

দাম—এক টাকা

স্বামীতীর্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিমাদ্রি-বক্ষ হইতে বারাণসীধামে

সমগ্র হিমারণ্য তখন মহাযোগীর ন্যায় ধ্যানস্থ। সেই ধ্যান ভঙ্গ করিতেছিল কেবল জমাটি ঝিল্লীরব ও অলকনন্দার নিম্নবাহিনী কলধ্বনি, আর মাঝে মাঝে কোনও সুরহারা পাখীর আর্ত্ত কাকলি! সেই গিরি-নদীর শান্ত করুণ বক্ষের তিনটি উন্নত পাষাণ-শিলায় তিনটি অমিতাভ সুন্দর মূর্ত্তি নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় সমাহিত ছিলেন। তিন জনেই গৌর-তনু। ত্রিমূর্ত্তির মধ্যভাগ অধিকার করিয়াছিলেন এক উন্নত-ললাট তেজঃপুঞ্জ-কলেবর বিশাল-বক্ষ জটাজুটধারী প্রাচীন মহাপুরুষ, আর তাঁহারই দক্ষিণ ভাগে বিরাজ করিতেছিলেন এক মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধ-ভিক্ষু-জনোচিত নবীন তপস্বী ও বাম ভাগ উজ্জ্বল করিতেছিলেন এক সতীত্ব-দীপ-শিখাময়ী আলুলায়িত-কুন্তলা নবীনা তপস্বিনী!

প্রাচীন মহাপুরুষটি কোন্ অনাদি কাল হইতে যে অলকনন্দার এই শিলাখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে

না, অনন্ত কালই তাহার একমাত্র সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বস্থিত শিষ্য ও শিষ্যাদ্বয় উভয়েই আধুনিক স্রোতের ফুল। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা হৃদয়ে সংসার-যন্ত্রণার গভীর আঘাত পাইয়া এই গুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন। শিষ্য স্ত্রী কর্ত্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং শিষ্যাও সপত্নীর প্ররোচনায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন, অবশেষে উভয়েই ভাবিতে-ভাবিতে শ্রীগুরুর কৃপালাভ করিয়া সাধনার জগতে অসীম উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

রাত্রি তখন প্রভাত হইয়া আসিতেছিল—অলকনন্দার বক্ষে শেষ কনক-জ্যোৎস্না তখনও বিদায় লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, পূর্ব্বদিকের ঊষালক্ষ্মী সবেমাত্র তাহার বালার্ক আলিপনার উপচার সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। এমনি সময়ে তরুণী শিষ্যা যেন সমগ্র ভারতাকাশের ঘুম ভাঙ্গাইতেই গান ধরিলেন ঃ—

বধির তিমির ভেদি—তোল গো যবনিকা…

ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষের সমুন্নত ললাট-শীর্ষে এই নূতন আশা-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যেন তৃতীয় নয়ন ফুটিয়া উঠিল। শিষ্য বাণেশ্বরও যেন এক ললিত ভৈরবীর ধ্যানালোকে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। শিষ্যা বিরজা তখনো একান্ত তন্ময়তার সহিত করুণসুরে সঙ্গীতালাপ করিতেছিলেন।

মহাপুরুষ অসীম স্নেহভরে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—কি গান গাইলি মা, ঈশানী? এমন গান কোথাও ত আর শুনিনি। তোর এই সঙ্গীতের সুরে ভারতের একটা মূর্ত্তিময় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে যেন খুঁজে পেলুম। এ যবনিকার কি তবে শেষ হ'ল মা? আজ তুই এ কি করুণালোক সম্মুখে এনে ধরলি, কী উদয়তোরণ আজ খুলে দিলি! তোদের নিয়ে

আমার দশ বৎসরের এই সুকঠোর আয়াস আজ কি সত্য সত্যই সফল হ'তে চল্‌ল মা ?

বিরজা করজোড়ে কহিল—ঠাকুর, সবই তো আপনার অপার করুণা! আপনার চরণে স্থান না পেলে এতদিন আমরা যে কোথায় ভেসে যেতুম কে জানে!

গুরুদেব বলিলেন—জীবনের সার্থকতা আজ যোগ্যতমের জয়ে নয়, অত্যুত্তমের বস্তিতে! আর এই আত্মসংগ্রাম বৈরাগ্যে নয়, আজ তার চেয়ে আমি মহত্তর বাণী শুন্‌তে পেয়েছি! আমি সত্য-সত্যই তোদের আর-একবারটি ফাসিয়ে দিয়ে দেখ্‌ব। দশ বৎসরের এই কঠোর সন্ন্যাসের পর, আবার তোরা সংসারে ফিরে যা! এখানে যা শিক্ষা হ'ল সেখানে তা'র পরীক্ষা হোক—

বিরজা গুরুদেবের কথার শেষ না হইতেই মিনতি সহকারে জানাইল—আর কেন শাস্তি দেবার মৎলব করচেন ঠাকুর? সংসার ত আমাদের চক্ষে নতুন নয়? সে-সংগ্রামে যে আমরা পরাস্ত হয়েই এসেছি। শোক-দুঃখের জ্বালায় যে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছি।

—কিন্তু এইবার তোমরা সেই সংগ্রামে জয়ী হ'ও—আমি এই আশীর্ব্বাদ করছি। তোমাদের দু'টি ভাই-বোনের মিলিত শক্তিকে আমি জগতের হাতে আজ নিযুক্ত করতে চাই। বিরজা, তুমি স্ত্রীজনের উন্নতি সাধন কর—বাণেশ্বর, তুমি পুরুষকে ফিরাও।

বিরজা ভীতি-সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিল—ঠাকুর, অপরকে ফিরাতে গিয়ে আমরাই যদি ভেসে যাই?

গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—না মা, আমি তোমাদের রক্ষা-কবচ পরিয়ে দিয়েচি—সংসারের কোনও প্রলোভনই আর তোমাদের মুগ্ধ করতে পারবে না। আমার একটিমাত্র উপদেশ সর্ব্বদার জন্য

তোমরা স্মরণ রেখো—নব স্বর্গের সন্ধান যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে মানুষের জন্য মানুষের ত্যাগে—মানুষের জন্য মানুষের দায়িত্বে!—সেই দায়িত্ব-ধর্ম্মে আজ তোমরা উভয়ে দীক্ষিত হও...বাণেশ্বর! তুমি প্রত্যেক মানব-কুটীরের দ্বারের ভার গ্রহণ কর, আর বিরজা প্রত্যেক অন্তঃপুরের ভার গ্রহণ করুক। জগতের লক্ষ-কোটী ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন্ আজ তোমাদের মুখেই মর্ম্মের বাণী শ্রবণ করুক।

বিরজা অধীর হইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর, আপনার চরণ-তল ছেড়ে আমরা এখান হ'তে কতদূরে গিয়ে পড়ব?

—কত দূরে কি মা!—আমি তোমাদের নিকটে নিকটেই থাকব,—ধ্যানে এতদিন আমাকে ভিতরে দেখে এসেচ—কর্ম্মে আজ আমাকে চাক্ষুষ দেখ; দেখ আমি কতরূপে আমার বিকাশ সাধন করি।

বাণেশ্বর মনে মনে তাঁহার রণ-চণ্ডিকা স্ত্রীর কথাই ভাবিতেছিলেন। সেই স্ত্রীর সান্নিধ্য যে তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য!—এই চিন্তাই যেন তাঁহাকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল।

অন্তর্য্যামী গুরুদেব বাণেশ্বরের এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রতি ত্রিনয়ন-পাত করিয়া শুধাইলেন,—কি ভাব্‌চ, বাণেশ্বর? যা সন্দেহ করচ, তা ভুল। তোমার চণ্ডিকা আজ ভুবনেশ্বরী-বিগ্ৰহ ধারণ করেচেন। আজ তিনি অন্নপূর্ণা, তোমার আর ভয় নাই ভিখারী,—তুমি আবার তাঁর দ্বারী হও! কিন্তু তোমার ছেলের খোঁজ রাখ কি? যাকে একটি বছরের শিশুপুত্র দেখে সেই কবে ফেলে এসেছিলে, আজ সে দশ বছরের কিশোর! তার দায়িত্ব-বোধ তোমার কোথায়? পিতার কর্ত্তব্য তুমি কি-ভাবে পালন করচ, একবার ভাব। তাকে ফেলে মোক্ষলাভ তোমার সুদূর-পরাহত।

বাণেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। দশ বৎসরের কৃচ্ছ্রসাধন, কুম্ভক, রেচক, পূরক, গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, ষড়দর্শন, যোগশাস্ত্র সব কি ফক্কিকারী! বাণেশ্বরের প্রাণে আজ বহুবৎসর পরে অমল পুত্র-বাৎসল্যের উদয় হইল। বিরজারও চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল—কারণ সেও যে পুত্রের জননী! বিধাতার ক্রূর পরীক্ষার নির্যাতনে আজ সে কোথায় আর তাহার শোণিতসম্বন্ধ নয়নের মণি সেই পুত্রই বা কোথায়? বিরজার সুপ্ত অন্তরের মধ্যে মাতৃ-স্নেহের প্রস্রবণ ছুটিল, পুত্রের মুখ মনে করিবার ব্যগ্রতা চোখে-মুখে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল।

উভয়েই শিলাসন হইতে অবতরণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে নতজানু এবং প্রণত হইয়া রহিলেন।

উভয়ের মস্তকে স্নেহাশীস ঢালিয়া সেই করুণাময় মহাপুরুষ উভয়কে বুঝাইয়া বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা কৃতকার্য্য হও!—আমার কাছে আজ হ'তে তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবসান ও সংসারক্ষেত্র শেষ-পরীক্ষার আরম্ভ!—জানি অনেক ঝড়, অনেক তরঙ্গ তোমাদের উদ্বিগ্ন করবে বটে—কিন্তু বিশ্বাসের পাথর হ'তে যেন তোমরা চ্যুত হ'য়ো না। মনে রেখ, আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছি।

রাত্রিকাল। চারিদিক্ রজত-জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। শুক্লাম্বর-পরিহিতা ধরণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই নিশীথ নির্জ্জনতার মধ্যে, মণিকর্ণিকার শ্মশান-ঘাটের অনতিদূরে এক বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক ভাগ্যহারা যুবক মনে মনে কত কথাই চিন্তা করিতেছিল।

—ভগবান, তোমার রাজ্যে এমন অবিচার কেন? একটা গণিকারও যে সম্ভ্রম আছে, একটা পথের কুক্কুরের যে স্থান আছে, আমার ভাগ্যে তাও লেখনি, ঠাকুর! আমি এতই সৃষ্টিছাড়া! যদি কোথাও আমার স্থান নাই, তবে এ বিশ্ব-গ্রাসী আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমায় গড়েছিলে কেন? সন্তানের প্রতি এ-হেন অবিচার—সন্তান আজ আর সহ্য করবে না—আজ শেষ-পথ সে বেছে নেবে—নেবেই। এই বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত যুবক চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লইয়া নিজের চাদরটিকে পাকাইয়া বটবৃক্ষের একটি শাখায় বাঁধিয়া ফেলিল।

যাহা তাহার প্রাণের সামগ্রী, তাহাতেই যে, তাহার অপরিসীম বাধা ও লাঞ্ছনাভোগ—এই প্রবল নৈরাশ্যই যেন তাহাকে আজ আত্মহত্যার শেষ-সীমায় উপনীত করিয়াছে! যুবক তাহার জীবনাধিক প্রিয়—ব্যর্থ পাণ্ডুলিপিখানির দিকে চাহিয়া আবার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে অভিযোগ জানাইতে লাগিল—কি পাপ করেছিলুম, ভগবান, যা'র জন্য আজ এত শাস্তি—এত মনস্তাপ-ভোগ! যা'র সেবা করে আমি সমগ্র বিশ্বের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পাবো ভেবেছিলাম, যার সাধনায় আমি আবাল্য উন্মাদ, যার জন্য আমি সকলের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছি, সেও যে আজ আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে!

এইবার যুবক নিজের গলদেশে সেই মৃত্যু-ফাঁস পরাইয়া দিয়া একটা উচ্চভূমির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

—মা, তুমি যে আমার বড় সাধের মানস-প্রতিমা! আজ আত্ম-বিসর্জ্জনে তোমাকেও যে বিসর্জ্জন দিতে চলেচি মা!—

বলিয়া সেই উচ্চভূমি হইতে পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া ঝুলিবার উপক্রম করিতেই কে যেন পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া বাধা প্রদান করিয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি, কেন এমন আত্মঘাতী কাজ করচো?

আশ্রম-কন্যা মঞ্জুশ্রীর রূপ লাবণ্যে চারিদিক উদ্ভাসিত
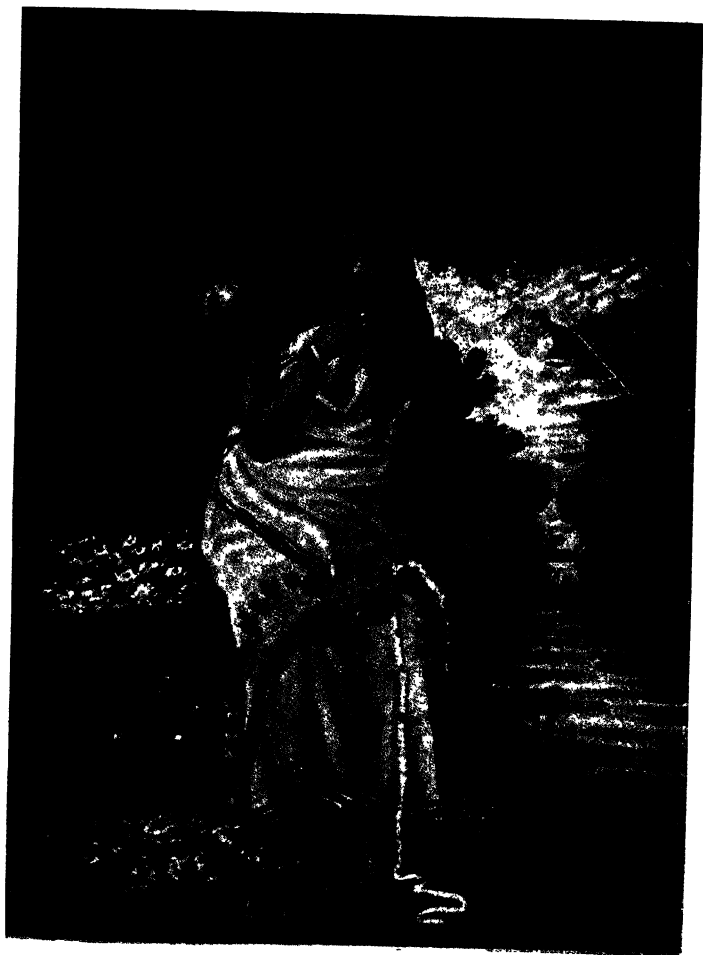
—কে আপনি, আমাকে ছাড়ুন! আমাকে আজ মরতে দিন, এ-বিশ্ব আমার মত হতভাগা চায় না—আমিও এ বিশ্বকে চাই না—আমাকে মরতে দিন!

—আত্মহত্যা করা মহাপাপ! বৎস ক্ষান্ত হও!

—আপনি কে?

—আমি গৃহহীন সন্ন্যাসী।

—আপনিই তবে উপযুক্ত ব্যক্তি।—আমার রচনা আপনারই হাতে দিয়ে আমি ইহজন্মের মত এই অনুভূতিহীন নির্দ্দয় জগৎ থেকে বিদায় নিতে চাই!

—কি তোমার রচনা, বৎস?

—'সন্ন্যাসীর সংসার'—এই নিন্, আমাকে এ-নিদারুণ ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিন।

সন্ন্যাসী জ্যোৎস্নালোকে সেই লিপির নাম দেখিলেন—বাস্তবিকই 'সন্ন্যাসীর সংসার'।

—যুবক, তোমার কল্পনার এ-সংসার-ভূমি তুমি পূর্ণ হ'তে দেখ্‌বে না? এই রঙ্গস্থলকে অপূর্ণ রেখেই তুমি মরতে চাও! এস, তোমার-আমার মিলিত শক্তিতে এই স্বপ্নের সংসারকে সত্যের রূপ দান করি—তোমার কল্পনা আর আমার সাধনা আজ একত্রিত হোক্।

—কে আপনি! আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনেই আবার যে আমার বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে! ভগবান কি এতদিন পরে যথার্থই আমার মর্ম্মের কথা শুন্‌লেন! আমি যে গভীর নৈরাশ্যে মহা নাস্তিক হয়ে পড়ছিলুম! আমাকে তুলে ধরবার জন্যই ভগবান কি আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন আজ! বিস্মিত যুবকের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ উত্থিত হইল—নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

—জীবনের এই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রাপথে হতাশ হ'ও না বৎস! আঁধার যতই ঘনীভূত, আলোও ততই অগ্রসর। আজ আত্মহত্যার পথ হ'তে ফিরিয়ে তোমাকে এক উদ্দেশ্যময় পথে আমি পৌছে দিয়ে যাব।

—কি সে উদ্দেশ্য প্রভু,—যাতে যথার্থই আমার পথ আমি খুঁজে পাবো—কি সে আলোক?

—প্রতিভার অন্বেষণ আর পতিতের উত্তোলন।—এইতো এ-যুগের ধর্ম্ম—একেই আমি জীবনের কর্ম্ম ব'লে ভেবেছি, বৎস।

বাণেশ্বর প্রগাঢ় বিস্ময়ে যেন তন্ময় হইয়া রহিলেন—তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি ঘটিল না—নয়ন সহানুভূতিপূর্ণ ও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

—যদি এমন যন্ত্রণার প্রলেপ জগতে বিতরণ করতে বেরিয়েচেন, তবে এই ক্ষুদ্র দাসও আজ থেকে আপনার সেবার ভিখারী—আপনার চরণের অনুসঙ্গী হয়ে এ-জীবনকে সার্থক করতে চায়।—বলিয়া যুবক সেই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

—কবি-হৃদয় রচনার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত—যশাকাঙ্ক্ষায় লোলুপ-নেত্র!...কঠিন আত্মত্যাগ ব্যতীত এ পথে সবই নিষ্ফল! এ জনহিতকর নীরস মার্গ তোমার কল্পনার কোন খাদ্যই যে যোগাতে পারবে না। বাসনাকে জয় যে তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব যুবক!

—"মৃত্যুটাকেই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সম্ভব করতে ছুটেছিল—সে প্রবল যশাকাঙ্ক্ষাকে, চিরদিনের জন্যই বিসর্জ্জন দিতে পারবে। এই নিন্ প্রভু, আমি বাসনাকে জয় করতে এই প্রাণের সামগ্রী চিরদিনের কল্পনা-রাজ্যকেও আজ জলাঞ্জলি দিলাম।—এই বলিয়া সেই যুবক জাহ্নবীর

চন্দ্র-করোজ্জ্বল তরঙ্গ-বক্ষে সেই পাণ্ডুলিপি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

—বৎস, তবে সত্যই তুমি আমার অনুসঙ্গী হতে পারবে!—তাই হোক্, তোমার আজিকার স্বার্থত্যাগে আমি আশাতীত ভাবে সন্তুষ্ট!—এই বলিয়া পিতা যেমন পুত্রকে গ্রহণ করেন, সন্ন্যাসীও তেমনি সেই অপরিচিত যুবককে স্নেহাশ্রয় দানে নিজের পথের সহযাত্রী করিয়া লইলেন।
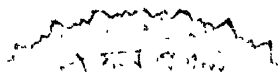
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোবারও শত্রু

প্রসাদপুরে সুষমার শ্বশুরবাড়ী এবং সুলোচনার বাপের বাড়ী। বিবাহ হওয়া অবধি সুষমার সঙ্গে সুলোচনার খুবই ভাব, কিন্তু আশৈশব সুলোচনার সঙ্গে সুষমার স্বামী মহেন্দ্রের আরো নিকটতম আত্মীয়তা। সুলোচনা মহেন্দ্রের বাল্য-সঙ্গিনী, কবে বিবাহ হইয়াছে তথাপি আজও সুলোচনা বাপের বাড়ী আসিলেই ছোট বোনটির মত বাল্যবন্ধু মহেন্দ্রের উপর তাহার দাবীর মাত্রা বাড়াইয়া দেয়, সুষমার প্রত্যহ চুল বাঁধিয়া দেয়, পায়ে আল্‌তা পরাইয়া দেয়, কপালে কাঁচপোকার টিপ পরাইয়া দিয়া পতি-সোহাগিনী করিয়া সাজায়।

সেদিন সকালে চুল বাঁধিতে বসিয়া উভয় সঙ্গীর মধ্যে অনেক কথাই হইতেছিল। নানা কথার পর সুষমা হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুলোচনাকে জানাইল—তাহার স্বামী রাত করে বাড়ী আসে, আবার কোন কোন রাত আসেও না।

—কোথায় যায়? তোর মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে ফেলে গিয়ে, কল্‌কাতায় কিসের আমোদ পায়? ভ্যাথ্‌ দেখি একবার আরসীতে তোর মুখখানা! এমন সোনার কমলকেও পুরুষ হয়ে অপছন্দ করে!—পায়ে আল্‌তা পরাইতে পরাইতে সুষমার মুখের কাছে সুলোচনা আয়নাটি ধরিল।

—তার কেবল ওই এক কথা!—'তোমাকে বিয়ে করতে পেলে না বলে সে ইচ্ছে ক'রে অধঃপাতে যাচ্ছে!'—বলিয়া সুষমা সুলোচনার হাত হইতে আয়নাটি লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

সুলোচনা একটু চিন্তিত হইয়া বলিল—ইচ্ছে ক'রেও কি কেউ অধঃপাতে যায়; মহেন্দ্রের এখনও কি সেই পাগলামি গেল না? বড়ই অবোধ সে, তার বোঝা উচিত—আমার কথা তার এখন মনে করলেও পাপ হয়। আমি পরস্ত্রী, পুত্রের জননী! কিন্তু এতে হবে কি জানিস্? আর আমি এ-জীবনে তোদের ত্রিসীমানাও মাড়াবো না। হয়তো বাপের বাড়ী আসাও আমি বন্ধ করে দেব। মহেন্দ্র কি আমাকে এতটাই দুর্ব্বল ভাবে!...সত্যি বলচি সুষমা, তোকে মা'র পেটের বোনের মত আমি ভালবাসি। তোর জন্যই আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়ি—তাই কেমন না এসে থাকৃতে পারি না। তা না হলে মহেন্দ্রের সঙ্গে কথা কওয়া ত দূরের কথা, আজকাল তার সামনেও আমার বেরুতে ইচ্ছে করে না।

সুষমা আবার বলিল—দিদি, তোমারই নাম তার জপমালা হয়ে রয়েচে। তুমি তার হলে হয়ত সে এ-জীবনে সুখী হ'তে পারতো।

সুলোচনা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বুঝেছি, এবার থেকে আমাকেই সাবধান হ'তে হবে—তোর মুখখানাকেও আমাকে ভুল্‌তে হবে। চলি ভাই, আকাশে মেঘ করেছে—ঝড় উঠতে পারে। বলিয়া ব্যথিতা সুলোচনা উঠিয়া দাঁড়াইল। এমনি সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে এক ভিখারিণী আসিয়া গান ধরিল—

"জল দে, জল দে ব'লে ডাকে যে চাতক, জল ত' দেয় না!
হানে বাজ শিরে, তবু পায় ধরে, তার পরাণ কেন রে যায় না—"

গান শুনিতে শুনিতে এক ভয়ার্ত্ত শিহরণে সুলোচনা অবসন্ন হইয়া পড়িল। আকাশের ঘনঘটার দিকে চাহিয়া সুষমাও তাহার ভবিতব্যকে একবার ভাঁল করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

—"আকাশের মেঘ দেখে কাতর হয়ো না—সাবধান হ'য়ো—মনে রেখ—কোন নারীর কলঙ্ক ম'লেও যায় না। আচ্ছা……আমি এখন চল্লুম—সময় হ'লে আবার হয়ত কোথাও দেখা হবে!"…বলিয়া সেই আশ্চর্য্যময়ী ভিখারিণী ভিক্ষা না লইয়া চলিয়া গেল।

সুষমা ডাকিল—"ভিক্ষা নিয়ে যাও মা, আমাদের অকল্যাণ হবে—" বলিতে বলিতে সে-ও ভিখারিণীর অনুসরণ করিল।

সুলোচনা ধীরে ধীরে আপন মনেই বলিতে লাগিল—ও ত, যে-সে ভিখারিণী নয়! ওর গানেই ত' আমাদের পোড়া বরাতের খোঁজ দিয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময় মহেন্দ্র একটা ক্যামেরা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রকে দেখিয়াই সুলোচনা মস্তক অবনত করিয়া প্রবল বিরক্তির সহিত সে-স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—সুলোচনা, আজ তুমি নাকি যাচ্ছো?

সুলোচনা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক বোধ করিল না—চলিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—এত গম্ভীর যে! আমার উপর রাগ করেচ, সুলোচনা?

—আমাকে ক্ষমা কর মহেন্দ্র—আমি তোমার ছেলেবেলাকার সেই ছোট বোনটি যে! দাদা হ'য়ে এ-কথা আজ ভুলে যাচ্ছ কেন?—

—দাঁড়াও, অনেক দিন পরে এসেচো। আবার কবে আসবে তার তো ঠিক নেই! যাবার বেলায় তোমার একখানি ফটো

তুলে নিই—এই বলিয়া মহেন্দ্র সুলোচনার গতির মুখে ক্যামেরা ধরিল।

সুলোচনা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—বুঝ্‌তে পারচি, জন্মের মত এই প্রসাদপুরকেও আমায় ত্যাগ করতে হবে। তুমিই আমার কাল হ'লে মহেন্দ্র—তুমিই আমার শনি।

—সুন্দর তুমি, তোমাকে দেখতেও কি দোষ সুলোচনা?

—মহেন্দ্র, তুমি উন্মাদ—দুরন্ত বালকের চেয়েও তুমি অবোধ!

—আমি উন্মাদ নই, আমি কাঙাল সুলোচনা,—তোমার এই বড় বড় চোখ দুটো দেখ্‌বার কাঙাল—তোমার দুটো মিষ্টি কথা শোনবার কাঙাল। মহেন্দ্র ক্যামেরা রাখিয়া সুলোচনার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

—তুমি না কি আমার স্বামীর বন্ধু?—তোমার এ-সব কু-প্রস্তাব আমি নিশ্চয়ই তাঁকে জানাব।

—জানাবে?—পাগল! কখনই তা পারবে না! যদি এক লহমার জন্য কোন দিনও এই হতভাগাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাক—আমার শত অপরাধ তুমি নীরবেই মার্জ্জনা করবে, ঘুণাক্ষরেও আমার কথা তোমার স্বামীর কানে তুমি তুল্‌তে সাহস করবে না।

সুলোচনা আর ক্ষণকালও তথায় অপেক্ষা করিল না—অবজ্ঞাভরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

দারুণ ভালবাসা হইতেই দারুণ ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। গভীর অভিমানে মহেন্দ্র আজ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। রূপোন্মাদ মহেন্দ্র সুলোচনাকে বাল্যাবধি ভালবাসিত। মহেন্দ্রের সঙ্গে সুলোচনার পাকা-দেখা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল—সুলোচনার পিতা হঠাৎ সে-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন। সেই নির্ম্মম বাধাতেই আজ এই বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি! সুলোচনাকে ইহজীবনে

সঙ্গিনীরূপে পাইল না বলিয়াই মহেন্দ্র যে দিনের পর দিন অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা বড় মিথ্যা নয়। এতদিন মহেন্দ্র সুলোচনার দর্শন পাইলে, তাহার মুখে ছুইটা হাসির কথা শুনিলেই কোনরূপে ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজিকার এই নিদারুণ উপেক্ষায় পাথরে বারুদের উপর যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িল।

সুষমা ভিখারিণীর দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—তাহার প্রভু অগ্নিমূর্ত্তি! সুষমাকে দেখিয়া মহেন্দ্র যেন আরও জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল—আমি বেশ বুঝতে পারচি এ সব তোরই ষড়যন্ত্র। সুলোচনার সন্দেহ তুই-ই বাড়িয়ে তুলেছিস্। বেরো, এখনি বেরো!—সঙ্গে সঙ্গে রাগে অন্ধ মহেন্দ্র লাথির উপর লাথি মারিয়া ক্ষীণাঙ্গী সুষমাকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল।

—ওগো, আমি কিছুই জানিনি—

গভীর যন্ত্রণাভরে সুষমা পেটে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

—ফের মিথ্যা কথা। তা না হলে সুলোচনা আমার সঙ্গে প্রতিবেশী বলে ছুটো কথার কথাও আজ কইলে না—আমাকে অপমান করে চলে 'গেল! নিশ্চয়ই এসব তোর কুমন্ত্রণা। ওঠ্ বলচি, তোকে আজই তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করবো—তোর মুখ পর্য্যন্ত আর দেখবো না! সুষমার উপর আবার পদাঘাত বৃষ্টি হইতে লাগিল।

বালকের নখর-বিচ্ছিন্ন কমলের ন্যায়, সুষমা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার প্রভুকে নিবেদন করিল—ওগো, এইমাত্র এক ভিখারিণী এসে একটা গান গেয়ে সুলোচনার মন খারাপ করে দিয়ে গেল!

—কোথায় সে ভিখারিণী? আমিই ত' তাকে গান শোনাতে পাঠিয়েছিলুম!

—কোথায় কেমন করে জান্‌বো? সে গান শুনিয়ে ভিক্ষা পর্য্যন্ত নিলে না—আমি তার পেছু পেছু গিয়েছিলুম, কিন্তু আর তাকে দেখা গেল না।

—কোন কথা তোর শুন্‌তে চাই না—তোকে নিয়ে আমার সংসার করা আর পোষাবে না। তোকে আজকার গাড়ীতেই আমি বাপের বাড়ী রেখে আস্‌ব! দে, সব গহনা-পত্র খুলে দে, তোকে আমি এক কাপড়ে বিদেয় কর্‌ব।

নির্য্যাতিতা সুষমা সব গহনা একে একে খুলিয়া আপনাকে নিরাভরণা করিতে বাধ্য হইল। একমাত্র অশ্রুজল ব্যতীত সুষমার আর অন্য আভরণ রহিল না। স্বামীর এই অকারণ নিগ্রহ নিরীহ কুলবধূ নীরবেই আজ ভোগ করিল। বাঙ্গালীর সংসারে একটা কথা আছে—বোবার শত্রু নাই,—কিন্তু এ-কথা মিথ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট-চক্র

কি কুক্ষণেই মহেন্দ্র সুষমাকে লইয়া তাহার বাপের বাড়ী পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছিল! মহেন্দ্রের প্রতিজ্ঞা বজায় রহিল—অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় জন্মের মতই আজ সুষমার প্রসাদপুরের সংশ্রব উঠিতে চলিল। সুষমা রেলে উঠিয়াও ভাবে নাই, তাহাকে স্বামীর নির্য্যাতন অপেক্ষা আরও কোন বিপদে গিয়া পড়িতে হইবে। ভোর রাত্রে শিয়ালদহে গাড়ী আসিয়া থামিলে পর, মহেন্দ্র স্ত্রীলোকের কক্ষে গিয়া সুষমাকে ডাকিল—উত্তর পাইল না। ঢুকিয়া দেখিল—সুষমা রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় গাড়ীর মেঝেয় লুটাইতেছে। সে-প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই—সুষমার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা।

ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; নানা লোকের নানা কথায় মহেন্দ্রের মাথা ক্রমশঃ হেঁট হইতে লাগিল। বিবাহ হইয়া অবধি মহেন্দ্র সুষমাকে একটা মিষ্ট কথা বলিয়াও সম্বোধন করে নাই, কিন্তু আজ সহসা নিরপরাধিনী সতী-স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া, চোখের কোণে তাহার অশ্রু দেখা দিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া মুর্চ্ছিতা পত্নীকে শিয়ালদহের হাসপাতালে লইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পর যখন জ্ঞান হইল, তখন সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল আমাকে কোথায় এনেচ ?

—হাসপাতালে।

—কেন ?

—তুমি ভাল হও, পরে বল্‌বো।

—আমি বুঝেছি ; বিধাতারও ইচ্ছে নয় আমি তোমার চরণে এ-জীবনে স্থান পাই। ওগো, স্বামী হয়েও তুমি আমাকে রক্ষা করতে পার্‌লে না! আমি তোমাকে কত ডেকেচি, তা জানো ? তখন রেল খুব জোরে চল্‌ছিল, তোমাকে ডাক্‌তে ডাক্‌তেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি! একটা সাহেব হঠাৎ আমার কাম্‌রায় টিকিট দেখ্‌তে উঠেছিল, সে-কাম্‌রায় তখন আর কেউ ছিল না। উঠেই আমাকে একলা দেখে সে আমার মুখটা আমার কাপড়ের আঁচলে বেঁধে ফেল্‌লে—আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—তোমাকে কত চেঁচিয়ে ডাকলুম—কিন্তু গাড়ী চলার আওয়াজে তুমি বোধ হয় শুন্‌তে পাও নি। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম—তারপর কি হয়েছে ওই জগদীশ্বরই জানেন।—বলিয়া সুষমা মুখ নত করিয়া রহিল।—

মহেন্দ্র গভীর অনুশোচনার সঙ্গে বলিল—আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করলুম সুষমা।

কেন দুঃখ করচো ? দোষ আমার অদৃষ্টের। বিধাতার ইচ্ছে অন্যরূপ। আর তুমি আমার মুখ দেখ্‌বে না তা আমি জানি, কিন্তু কি বলে এ পোড়ার মুখ আমার বাপ-মাকে দেখাবো ?

মহেন্দ্র আবেগের বশে জানাইল—ভেবো না সুষমা! যখন আমার জন্যই তোমার মুখ পুড়েছে, তখন আমিই তোমার এ কলঙ্কের ছাপ আমারই বুকে ঢেকে রাখ্‌বো। তুমি ভাল হ'লে আমি তোমাকে আবার আমার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করবো।

—জানি, গ্রহণ তুমি কর্‌বে না, আর আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাকে গ্রহণ করতে বল্‌বো ? আমি যে তোমার চিরশত্রু! আমার

জীবনের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে-শক্রতা বোধ হয় যাবে না! ওগো, আবার অত্যাচারী হ'য়ো, এ-জন্মে হ'ল না—পরজন্মে হ'য়ো—আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।—সুষমা পাগলিনীর ন্যায় উদাস দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

মহেন্দ্র আশ্বাস দিয়া বলিল—আমি তোমার স্বামী, তোমাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম।—আমি তা' যখন পারলুম না, তখন দেশান্তরী হয়েও আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী—তোমাকে যে অগ্নিসাক্ষ্য করে গ্রহণ করেচি! তুমি ভাল হও! তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার চরিত্র, তোমার পবিত্রতা আমি জানি। যদি চূণ-কালি পড়ে থাকে, তোমার একার নয়, আমার গালেও পড়েচে!—মহেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুষমা স্বামীর হাত ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—তুমি উঠ্‌চ যে!

—ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক্‌বে—তারপর এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তোমাকে এখানে রাখ্‌বার আমার উদ্দেশ্য, যেন এ-ঘটনাটা আর-কোথাও না ছড়িয়ে পড়ে।

—ওগো, জগতে আজ কি আমার কেউ নেই! এই হাসপাতাল আর ওই পথ!—এ ছাড়া আর যে আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে!

—ভয় কি? আমি আবার আস্‌বো।

—না, আমার মন বলছে—তুমি আর আসবে না—ইচ্ছে থাক্‌লেও আর আসতে পারবে না। আমার জন্যে তোমার মাথা হেঁট হয়েচে, এখন আমার দিকে চাইতেও তোমার মাথা হেঁট হবে। আর কি বল্‌বো—ভগবান্ তোমার মতি-গতি ফিরিয়ে দিন—তুমি সুখী হও···আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করি।

—সুষমা, আমার অদৃষ্ট!—বলিয়া মহেন্দ্র বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

তখন পাখী ডাকিতেছিল—আকাশের শুকতারা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। রাজপথের দীপালোক একে-একে নিবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাত্রি পোহাইলে মহেন্দ্র যে আর পথে মুখ ফিরাইতে পারিবে না, এই ভাবনায় সে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিল না।

সকাতর দৃষ্টিতে স্বামীর উদ্বেগ নিরীক্ষণ করিয়া সুষমা চির নিঃসহায়ার ন্যায় বলিয়া উঠিল—একবারটি দাঁড়াও!—তোমার পা-দু'খানায় আমাকে মাথা রাখ্‌তে দাও!···ওগো! তোমার শত অত্যাচার যে আমার কাছে চিরদিনই মধুর বলে মনে হ'ত!

মহেন্দ্র আর একবার ফিরিয়া তাকাইল। তারপর মহা অপরাধীর ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া একেবারে ফুটপাথে আসিয়া পড়িল।

কয়েক দিনের পরই সুষমা ভাল হইয়া উঠিল। রোগী ভাল হইলে তাহাকে আর হাসপাতালে রাখিবার নিয়ম নাই। এদিকে মহেন্দ্রও আর এ-পথ মাড়ায় না। কোন আশা ও উপায় না দেখিয়া সুষমাকে অগত্যা পথের বাহিরেই পা দিতে হইল। সুষমা পথ জানে না। তাহার ভরা যৌবন, ভরা রূপ, ভরা লজ্জা—অনেকের সন্দেহ দৃষ্টিতে পড়িল বটে, কিন্তু সুষমা কোন দৃষ্টিকেই গ্রাহ্য করিল না—তাহার মনের মধ্যে দেবাশিসের ন্যায় সাহস আসিল! সেই সাহসে সাহসী হইয়া সুষমা একাই রেলের টিকিট কিনিয়া প্রসাদপুর যাত্রা করিল। আর সে কাহাকেও ভয় করে না, এখন অপরে তাহাকে ভয় করে।

গ্রামের হাঁটা-পথ ধরিয়া প্রসাদপুরে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর ভিটায় তালা-চাবি পড়িয়াছে—একটা হতশ্রী ও বিষাদের ম্লানছায়া যেন ঘর-বাড়ী, বাগান, পুকুর—চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! আজ যেন সবাই তার অপরিচিত। সুষমাকে একাকিনী দেখিয়া গ্রামবাসীরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রয়, ভাবে—এ আবার কে? কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করে না।

সুষমা পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার নিঃসহায় অবস্থার কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় গ্রামের নবীন কলু সুষমাকে জমিদার মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা জননী, পেন্নাম হই গো—আপনি এখানে!

নবীন কলু সেদিন মাল খরিদ করিতে কলিকাতায় যাইতেছিল।

—তোমাদের বাবু কোথায়, নবীন?

—বাবু নাকি পশ্চিমে হাওয়া খেতে গিয়েছেন মা,—তাই সব বন্ধ। চাকর-দাসীরাও নেই।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ নবীন?

—কলকাতায়।

—আমাকে ভবানীপুরে আমার বাপের বাড়ীতে রেখে আস্‌তে পারবে নবীন? তোমাদের প্রসাদপুরের পাট্ বুঝি আমার এ-জন্মের মতই উঠ্‌ল!

সুষমার চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র যে সুষমাকে দেখিতে পারিত না—এ-কথা নবীনের অজ্ঞাত ছিল না, অথচ সুষমার ন্যায় মহীয়সী মহিলাকে সে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইতে কৃপণতা করিল না! বলিল—মা, বাবুর প্রজা আমি। তুমি আমাদের জননী। তোমার আদেশ তো অবহেলা করতে পারবো না মা।

নবীন-কলু সুষমাকে অতঃপর তাহার পিত্রালয় ভবানীপুরে পৌছাইয়া দিতে চলিল। কিন্তু সেখানেও সুষমার স্থান মিলিল না। সুষমাকে স্থান দিলে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, হিন্দু আদর্শ যে রসাতলে যায়! হায় রে, নির্ম্মম দেশাচার!···অথচ শাস্ত্র একথা বলে না! কাশীখণ্ড গৃহস্থ-ধর্ম্মের চত্বারিংশ অধ্যায় বলে—"বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলে বা চোর হস্তগত হইলেও নারীকে ত্যাগ করিবে না; ইহার ত্যাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।"

সুষমার অবস্থাপন্ন পিতামাতা অতি কষ্টে, অতি সংগোপনে দিনের বেলাটা কোন মতে স্নেহ ও অশ্রুতে সুষমাকে বুকে ধরিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সুষমার বিষয়ে কিঞ্চিৎ কানাকানি তাঁহাদেরও কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, অমনি কন্যার দিকে তাঁহারা আর তাকাইতে সাহসী হইলেন না, সমাজ-ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িলেন।

পিত্রালয় হইতে বিতাড়িত হইয়া জনৈকা পুরাতন দাসীর সঙ্গে সুষমা যখন নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে পদব্রজে গড়ের মাঠ পার হইতেছিল, তখন সন্ধ্যার কৃষ্ণ-কবরী কলিকাতা নগরীকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—আকাশে তখন তারার ফসল ফুটিয়া উঠিয়াছে—রাজপথও দীপের [illegible] ঝলমল করিতেছে। এতদিন পরে সুষমা সত্যসত্যই আশ্র[illegible] নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

—আমি গঙ্গায় ডুবে মর্‌ব, সেও ভাল [illegible] কখনও পা দেবো না।—সুষমা দৃঢ়[illegible] জোর গলায় জানাইল।

—সে কি দিদিমণি, এই [illegible] সাধ-আহ্লাদ। এ-বয়সে তুমি ডুবে মরবে! আ আমা[illegible]াল!—কেন? কার জন্যে? স্বামী-বাপ-মার দরদ ত' বুঝলে? ভয় কি তোমার? ভাবনাই বা কিসের এত? এত বড় কলকাতা সহর—কত তা'তে বড় লোকের

ছেলে। তোমার আবার ভাবনা—মেয়েমানুষের রূপ-যৌবন থাকলে আবার ভাবনা!

—এসব কথা বলতেও কি তোর জিব্ খসে পড়চে না?—ভগবান্ বোধ হয় নেই, তা না হ'লে এখনি তোর মাথায় বাজ পড়া উচিত ছিল। তুই না আমাদের পাড়ার বুড়ো ঝি—ঠাকুরমার বয়সী!—তোর ভিতরে এত প্যাঁচ!

তখন উভয়েই মনুমেন্টের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। ঠিক সেই স্থানেই, একজন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী ও একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী কান পাতিয়া সুষমা ও দাসীর বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যকে আদেশ করিলেন—ভবেশ, দেখ তো কেউ বিপন্ন হ'ল কি না! রমণীর কণ্ঠস্বর ব'লে মনে হচ্চে যেন…

যুবক তখন ঘটনাস্থলে ধাবমান হইলেন।…

সন্ন্যাসী সুষমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা, তোমার হয়েছে কি? …ন অবস্থায় যে তুমি?

—বাবা, জগৎ-সংসার আমার ভার বলে বোধ হয়েছে। আমায় … আমার মরবার পথ বলে দি'ন—আমি মা-গঙ্গাকে খুঁজ্চি!

… এ স্ত্রীলোকটি কে?

… নিয়ে যেতে চায়—নরক হ'তে আরও নর… অত্যাচারে আমার এ-জগতে আর স্থান নাই!

—স্থান নাই!- … অজস্র সূর্য্যালোকের নিয়ে—এই অফুরন্ত তৃণাধ… তোমার স্থান নাই! যদি না থাকে, তোমার … ব!—বলিতে বলিতে বাণেশ্বরের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভ…

বৃদ্ধা ঝি আর সেখানে দাঁড়াইল না, বিপদ বুঝিয়া সরিয়া পড়িল।

বাণেশ্বর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জানাইল—এস মা, আমিই তোমার স্থান ঠিক করছি।...

সন্ন্যাসী আর কেহই নহেন—হিমালয়ের সেই সংসার-ভীরু বাণেশ্বর, আর ভবেশ—কাশীর সেই আত্মবিনাশোদ্যত যুবা।

বাণেশ্বরের ভিতরে একটা আলোড়ন চলিতেছিল। দুইটি কঠিন সমস্যা আসিয়া তাঁহার ন্যায় নিস্পৃহ সাধক-চিত্তকেও লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া তুলিতেছিল। প্রথম সমস্যা ভবেশকে লইয়া,...ভবেশের ভিতর অমানুষী প্রতিভা ছিল বটে, কিন্তু কিছুই তপস্যা ছিল না। কঠোর সাধনার পথে ভবেশকে অনুসঙ্গী করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। দ্বিতীয় সমস্যা, কেমন করিয়া এই আশ্রয়হীনা কুলনারীর জন্য সতত-ক্রুদ্ধা কর্কশ-ভাষিণী তাঁহার পত্নীর আজ দ্বারস্থ হইবেন।

বাণেশ্বর একবার মনে করিলেন, সকল কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার জগদ্-গুরুর নিকট ফিরিয়া যান ও এই অসহনীয় সংসার-দহন হইতে মুক্তি ভিক্ষা করেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আমি কি এতই কাপুরুষ! 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

তাহাই হইল। বাণেশ্বর আগে আগে চলিলেন, সুষমা তাঁহার পশ্চাতে, আর সুষমার পশ্চাতে ভবেশ অনুবর্ত্তী হইল।

কার্জ্জন-পার্কের আলোকমালার উৎসবে, পশ্চাদ্বর্ত্তী ভবেশ নির্য্যাতিতা সুষমাকে দেখিল অসামান্যা সুন্দরী! সে নয়ন দিয়া সেই রূপ-মধু আস্বাদন করিতে করিতে চলিল, যাহা সুষমাও জানিল না, বাণেশ্বরেরও অজ্ঞাত রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ে

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে, আহিরীটোলায় বাণেশ্বরের শ্বশুরালয়। বাণেশ্বর বড়লোকের জামাতা হইবার সৌভাগ্য পাইলেও নিজের দৈন্য-দশাবশতঃ তথায় তাঁহাকে একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করা হইত না। স্ত্রীর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়িত না, স্বামীকে বাটীর দ্বারবান্ অথবা পাচকের মতই সে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। বাণেশ্বর সেই ঘৃণায় দেশত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ দশ বৎসর পরে একান্ত নিরুপায় হইয়া, আশ্রিত-রক্ষণে পুনরায় সেই স্ত্রী-ধামে আসিতেই বাণেশ্বর বাধ্য হইলেন। বিশাল অট্টালিকার সম্মুখীন হইয়া বাণেশ্বর দেখিলেন, বহুকালের সেই পুরাতন ভৃত্য কৈলাস একটি বালকের বায়নায় সান্ত্বনা দিতেছে। বালক কুল্পী-বরফ খাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছে, বৃদ্ধ বুকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহাতে বাধা দিতেছে। কৈলাস সেই সংসারের একমাত্র অভিভাবক—কেবল ভৃত্যই নহে।

সুষমা ও ভবেশকে পশ্চাতে রাখিয়া সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি বুড়ো, আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছো?

—কে, জামাই বাবু? জামাই বাবুর স্বর ব'লেই তো বোধ হচ্চে! কই, চেহারায় ত কিছু ধরতে পারচিনে!—কৈলাস অবাক্-দৃষ্টিতে সেই সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল এবং অনেকক্ষণ পরে নিঃসন্দেহ

হইয়া বলিল—সত্যই ত আমাদের জামাইবাবু! একেবারে সন্ন্যাসীর বেশ! দশ বৎসরে চেহারা কত বদ্‌লে গেছে! এতদিন পরে তোমার হুঁস হ'ল জামাইবাবু? তোমাকে খুঁজতে এ-বুড়োবয়সে কত দেশ তোল-পাড় ক'রে ফেল্লুম, কোথাও তোমার খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। তারপর তোমার হাল একরকম ছেড়ে দিতেই হ'ল। সে কি আজ্‌কের কথা জামাইবাবু, দশ-দশ বছর ঘুরে গেল। যাকে এক বছরের দেখে ফেলে গিছ্‌লে, সে আজ দশ বছরের হয়েচে। এই তোমার ছেলে, এ-বুড়োর কোলে পিঠে আজও মানুষ হচ্চে। এইবার তোমার দায়িত্ব তুমি নাও, বাবু!

অতঃপর সেই বালককে সম্বোধন করিয়া বলিল—ওরে সন্তু, এই দ্যাখ্ তোর সন্ন্যাসী-বাপ···একেবারে পাষাণ হয়ে গিছলো। বলিতে বলিতে কৈলাসের নয়ন-কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

···সন্তুর কিছুই মনে পড়ে না। তার পিতার কথা সে কেবল শুনিয়াছে মাত্র—পিতৃ-বাৎসল্যের স্নেহাস্বাদ—জন্মিয়া অবধি সে কোন দিনও গ্রহণ করে নাই। অপরিচিত সন্ন্যাসীর দিকে বালক কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

বাণেশ্বর ব্যস্ততা জানাইয়া কৈলাসকে বলিলেন—কৈলেস, আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এসেচি, তোমার উপর একটা ভার দিয়ে আমি এখনই চলে যেতে চাই।

—সে কি কথা জামাইবাবু! কত দিন পরে এলে, আর বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়াতেই তুমি চলে যেতে চাচ্চো? ভয় নেই—সে হতভাগী এখন শুধ্‌রে গেছে—যা'র জন্যে তোমার এই অবস্থা—সে আজ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। একটু দাঁড়াও, তাকে আমি একবার খপর দি'··· সন্তু, তোর বাপকে দেখিস রে!—বলিয়া কৈলাস ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীর ভিতর খবর দিতে গেল।

বাণেশ্বর সেই অবসরে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুষমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—মা, তুমি এইখানেই থাক, তোমার কোন চিন্তা নাই, এরা তোমাকে কখনই ফেল্‌তে পারবে না। আর যদি এখানে একান্তই আশ্রয় না পাও, আমি তোমার অপেক্ষায় কাল নিমতলার শ্মশান-ঘাটে থাক্‌বো, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

সুষমাকে সেই গৃহদ্বারে ফেলিয়া, বাণেশ্বর ভবেশকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তখন রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। সুষমা সেই দ্বারদেশে সন্তুর পার্শ্বে নীরবে নিশ্চল নেত্রে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিতার পলায়ন দেখিয়া সন্তু ভাবিতেছিল, এ আবার কেমন ধারা বাবা?

দশ বৎসরের পর অকস্মাৎ স্বামীর অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ শুনিয়া মহামায়া দামিনীগতিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—তাহার হৃদয়-দেবতা নাই, কেবল এক ভয়-চকিতা রমণী সন্তুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

মহামায়ার মুখপানে চাহিয়া কৈলাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—জামাইবাবু কি তবে আবার পালালো? সন্তু, তোর বাপ কোন্ দিকে গেল রে? কৈলাস অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া দেখিতে দৌড়িল।

সুষমা একান্ত সভয়ে দাঁড়াইয়াছিল—গৃহস্বামীনীকে দেখিয়া ভরসা পাইল। মহামায়া সেই দৃষ্টি-বিহ্বলা অপরিচিতাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল—তুমি কে বোন, দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌চো?

—নিজের অদৃষ্টের কথা, দিদি! একজন সদাশয় সন্ন্যাসী আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, বল্লেন, আপনারাই আমাকে রক্ষা করবেন। তিনি কি আপনার স্বামী?

মহামায়ার আজ সব অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্ত্রীলোককে দেখিয়া স্ত্রীলোকের ঈর্ষাই হয়—বিশেষতঃ যদি তাহার রূপের আকর্ষণ থাকে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাহা ঘটিতে পাইল না। মহামায়া কেবল জানিতে উৎসুক হইল—তুমি আমার স্বামীকে কি-সূত্রে জান্‌লে ?

তখন সংক্ষেপে সুষমা সকল কথা বুঝাইয়া দিলে, ঐকান্তিক সহানুভূতির সহিত সম-ভাগ্য-ভাগিনী বলিয়া স্বামি-পরিত্যক্তা মহামায়া স্বামি-পরিত্যক্তা সুষমাকে বুকে টানিয়া লইল।—মহামায়া কহিল—এস বোন্, তুমি যখন আমার স্বামীদত্ত ধন, তখন আমি তোমাকে হৃদয়ের হার করেই সযত্নে রাখ্‌বো—এই বলিয়া মহামায়া পথ হইতে সুষমাকে সাগ্রহে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল। সুষমা এতদিন পরে সত্যসত্যই নিরাপদ আশ্রয় পাইল।

কৈলাস আসিয়া জানাইল—জামাইবাবুকে পাওয়া গেল্ না, মা !

—তবে কি হবে, কৈলেস ?

সুষমা জানাইল—এ-রাতটা কোনমতে কাটান্ দিদি, কালকে আমরা তাঁকে খুঁজে বের কর্‌বোই। তিনি বলে গেলেন, যদি না আপনারা আমাকে আশ্রয় দেন, নিমতলার ঘাটে তিনি আমার জন্যে কাল অপেক্ষা করবেন।

একদিকে ভবেশের অসাধারণ প্রতিভা, অন্যদিকে বাণেশ্বরের সুকঠোর সাধনা—জগৎকে আজ নূতন ছাঁদে, নূতন পদ্ধতিতে গঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে মুহূর্ত্তে বাণেশ্বরের কর্ম্ম-জীবনে শৈথিল্য আসিয়া জন্মায়, সেই অবসরে ভবেশের এক-একখানি সঙ্গীতের উদ্দীপনা বাণেশ্বরের প্রাণে শত মাতঙ্গের উৎসাহ-সঞ্চার করে! ভবেশের সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাণেশ্বর কর্ম্ম-প্রেরণার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া বলেন—

কি বললে ভবেশ? 'ধরণীর আজ একই পতাকা, মানবের আজ একই মন!'...তোমার যাদুকরী প্রতিভার নিকট আমার আয়াস-সঞ্চিত সাধনা সামান্য—নিতান্ত তুচ্ছ! বৎস, তোমার কল্পনা-শক্তি অতুলনীয়, তুমি এ-বিশ্বকে এতটা ভালবাসতে শিখেচ!

ভবেশ বলে—প্রভু, আমি তরলমতি, কল্পনা-প্রবণ, সতত-চঞ্চল-চিত্ত জীব, আপনার কর্ম্ম-শক্তির অমোঘ কাঠিন্য আমাকে দিন! আমি অন্যকে মোহিত করি বটে, কিন্তু আমি নিজেও সে দৃশ্যে মোহিত হই—আমি যেমন অপরকে বিচলিত করি, নিজেও তেমনি বিচলিত হই—

—হৃদি-স্থিত হৃষীকেশের শরণাপন্ন হও, বৎস। জগন্ময়ী জগন্মাতার মূর্ত্তিপূজায় মন ঢেলে দাও!

গুরুদেবের এই কল্যাণময় উপদেশ-বাণীতে নিমিষে-নিমিষে গুপ্ত অপরাধী ভবেশের প্রাণে একটা লোমহর্ষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়, ভবেশ ভাবে—কই, সুষমা,—এ-নামকে ত আমি আজ পর্য্যন্তও মন হ'তে উপ্‌ড়াতে পারলুম না—গুরুদেবের এত আধ্যাত্মিক উপদেশেও ত আমার শয়তান মনকে সুষমার অভিনিবেশ হ'তে ফিরাতে পাল্লে না!

গঙ্গাতীরে—সন্ধ্যার আঁধারে বসিয়া গুরু-শিষ্যের কথোপকথন হইতেছিল—এমন সময়ে বৃদ্ধ কৈলাস নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহার গ্রাম্য ভাষায় কহিল—জামাইবাবু একবার এদিকেও চাও গো, আমরা না হয় মহাপাতকী হয়ে পড়েছি, কিন্তু এই দুধের বালক কি এমন পাপ করলে যে, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্চ?

বাণেশ্বর সংসার-বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—কৈলাস, আমি দেবতার সন্ধানে বেরিয়েচি, আমাকে আর জড়িও না! এ সবই আমার চক্ষে এখন এক গোলক-ধাঁধাঁর মত অভিনব ও অপরিচিত বলে ঠেক্‌চে। কৈলাস, আমি জগতের কাজে বেরিয়েচি—এ মিথ্যা প্রপঞ্চে আমাকে

আর ভোলাবার চেষ্টা ক'রো না—আমাকে তোমরা অবিলম্বে পরিত্যাগ করো। বলিতে বলিতে বাণেশ্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কৈলাস এইবার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা মহামায়ার দিকে ফিরিয়া মৃদু তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিল—এখনো মুখটি বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি মা, এততেও তোর অহঙ্কার গেল না? গুমোর করে আর কতকাল বসে থাক্‌বি?—একবার পায়ে ধরে যোড় হাত করে ছ্যাখ্‌—যদি ফিরাতে পারিস্‌!

মহামায়ার অহঙ্কারকে বজায় রাখিতে নির্যাতিতা সুষমা বাণেশ্বরের সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া বসিয়া জানাইল—বাবা, আমি স্থান পেয়েচি—এঁরা আমাকে ফেল্‌তে পারেন নি, কিন্তু যিনি আমার আশ্রয়দায়িনী, তাঁকে আশ্রয় দেবার কি কর্‌চেন? তিনি যে আপনার মতই আজ তপস্বিনী!—তাঁর জীবনের যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! ভূমিতল তাঁর শয্যা—একবেলা তাঁর অনাহার—মাসের অর্দ্ধেক দিন তাঁর উপবাস!

বাণেশ্বর উত্তর দিলেন—আমার বন্ধনে আর বন্ধন বাড়িয়ে তু'ল না মা! তোমরা যদি প্রকৃতই আমাকে চাও—তবে আমার কর্ম্মকে চাও! আমার উপর তোমাদের যে অসীম অনুরাগ—তা' জগতে বিলিয়ে দাও—দেখ্‌বে, নরক স্বর্গ হয়েচে—সংসার হয়েচে শ্রীক্ষেত্র!

মহামায়া এইবার নিকটে আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—বলুন, কি করলে আপনার সেই কর্ম্মকে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসী হলেও আপনি আমার আরাধ্য স্বামী, জন্ম-জন্ম আমি আপনার সেবিকা—সহধর্ম্মিণী; আপনার কর্ম্মকেই আমি কায়মনোবাক্যে পেতে চাই।

বাণেশ্বর মহামায়ার প্রশ্নে আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন—মহামায়া, তুমি কি প্রকৃতই আমার সহধর্ম্মিণী হতে পারবে? বিলাস এবং অহমিকাই যে তুমি একদিন জীবনসর্ব্বস্ব ভেবেছিলে। তুমি কি

জগতের অশ্রুজলসিক্ত দারিদ্র্যকে সমবেদনায় বরণ করে নিতে পারবে? মহামায়া, তুমি যে, বাঙ্গালীর ঘরের নির্জীব প্রতিমা! আমার যে অরণ্যে রোদন করা হচ্ছে!

মহামায়া উত্তর দিল—স্বামী, আপনার নিকট গুরুমন্ত্র যখন পেয়েচি—তখন আপনার শিষ্যা দাসীও আজ সচল প্রতিমা! আপনার আশ্রম-কুটীরকেই আজ থেকে আমি জীবনের স্বর্গ করে তুলবো! আমি আপনার স্মৃতি ও দর্শন এক করে ফেল্‌বো—দেখি আজ হতে আপনার আশীর্ব্বাদ পাই কি না! আপনি জগতের হিতে বেরিয়েচেন, কিন্তু আমার ধ্যানের জগৎ যে আপনি! আজ থেকে আমরাও আপনারই মত সন্ন্যাসী হয়ে যাবো।

বাণেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ভবেশ, তোমার পাণ্ডুলিপির কথা ভাবো, তোমার কল্পনার 'সন্ন্যাসীর সংসার' আজ সত্যসত্যই বুঝি 'সন্ন্যাসীর সংসার' হতে চল্‌লো।

বাণেশ্বর আবার চমকাইয়া বলিলেন—না ভবেশ, আমি ভুল বুঝেচি! —সন্ন্যাসীর সংসার নয়, জগন্মাতা জগদম্বার সংসার—শ্মশানচারী—নিরুপাধি শিবের সংসার!…

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিস্ত্রীর ছেলে

দীনবন্ধু বাবুর পিতা তিনু মিস্ত্রী, স্বনামধন্য ও সদাব্রত ছিলেন। কিন্তু জাতিতে কর্ম্মকার বলিয়া, লক্ষপতি হইয়াও 'মিস্ত্রী' ব্যতীত কোন দিনও 'তিনকড়ি—বাবু' সাজিতে সাহসী হন নাই।

কিন্তু তিনু মিস্ত্রীর দেহপাতের পর হইতেই তাঁহার একমাত্র পুত্র দীনবন্ধুকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি সজ্জন-মোসাহেবের দল ঘিরিয়া বসিল। হীনজাতি বলিয়া এই সব বসন্তের সহচরগণ দীনবন্ধুকে মনে মনে এবং আড়ালে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও কাঞ্চেনীর জন্য সম্মুখে সকলেই 'মশায় মশায়' বলিয়া তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা সেই লোক-চরিত্রানভিজ্ঞ যুবককে এমনি ভাবে হস্তগত করিয়া লইল যে, তাহার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত দীন আত্মীয় স্বজনগণও দিনে-দিনে তাহার বিরক্তি-ভাজন হইয়া উঠিল।

সহানুভূতির অভাবে, এবং বিলাসিতার প্রভাবে, দীনবন্ধুর স্বর্গীয় পিতাঠাকুরের নিত্য সদনুষ্ঠানগুলিও একে একে লোপ পাইতে বসিল।

আজকাল পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কলকারখানাগুলিকে অচল করিয়া, দীনবন্ধু গাড়ী-জুড়ী চড়িয়া বাবুর মত কেবল হাওয়া খাইয়া বেড়ায়। যে-বাড়ীতে একদিন ইষ্টদেবতার ভোগ-রাগ চড়িত, এখন তথায় বাঈজীর ঠুংরী ও টপ্পার মজলিস বসে।

দরিদ্রের হাহাকার আর দীনবন্ধুর ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে পায় না।

তিনু মিস্ত্রীর নাম যেমন এখনও গরীব-দুঃখীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, দীনবন্ধুবাবুর নামও তেমনি বড় বড় মোসাহেব ও নর্ত্তকীদের জপমালা হইয়া থাকে। যে তিনু মিস্ত্রীর—লক্ষপতি হইয়াও জানুর নিম্নে কখনও কাপড় নামিয়া আসে নাই, অঙ্গে একটি পিরাণও চড়ে নাই, তাঁহারই পুত্রের এত সৌখীনতা ও রসবোধ কোথা হইতে জন্মায়, ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক মনস্তাত্ত্বিকেরও মাথা ঘুরিয়া যায়।

'আর কারও নয় সে যে আমারি বঁধু।'—এই পদটি যখন বারবার বাঈজীর কিন্নরী-কণ্ঠে নানা হাবভাব-সহকারে চাটুকারবেষ্টিত সভার মাঝে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তখন দেউড়ীর সম্মুখে সন্ন্যাসী বাণেশ্বর ও ভবেশ দ্বারবানকে অনুরোধ করিতেছিলেন—পথ ছাড়ো মহারাজ,—তোমার কোন ভয় নেই, বাবুরা কিছু বলবেন না। বাঈজীর গান শুনতে তোমার বাবু আজ আমাদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা মিছামিছি তোমাদের বাবুকে বিরক্ত করতে আসিনি।

—"আইয়ে, চলিয়ে!'—বলিয়া দ্বারবান্ সেই আগন্তুকদ্বয়কে বাবুর খাস্-কাম্‌রায় লইয়া হাজির করিল। তখন বাঈজীর কণ্ঠে—"কদম বনমে, মদনমোহন খাড়ে বংশী বাজাতেহেঁ।"—এই পদটিই আর শেষ হইতে চাহিতেছিল না।

সন্ন্যাসীদ্বয়ের হঠাৎ এইরূপ অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মজলিসের বিশুদ্ধ রসালাপে বাধা পড়িল।

বাণেশ্বর দেখিবামাত্রই তাঁহার বাল্যসহপাঠী দীনবন্ধুকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু বহুকাল পরে তাহার বাল্যবন্ধুকে সন্ন্যাসীর গৈরিকবেশে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

—দীনবন্ধু, চিন্‌তে পার কি? আমি তোমার বাল্য-সহপাঠী বাণেশ্বর!

—কে, বাণেশ্বর-দা!—তুমি এখন সন্ন্যাসী! একটি চেলাও যে যোগাড় করেছ দেখছি···তা' এতকাল পরে কি মনে করে?

দীনবন্ধু বহুকাল পরে বন্ধুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া রহিল।

—তোমার কাছে আমার কিছু ভিক্ষা আছে হে! কিন্তু হঠাৎ তোমার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করতে এলুম, তোমার বন্ধুরা হয়ত রাগ কর্‌চেন।

—তা' করুক—স্ফূর্ত্তিও অনেক সময় আমার তিতো লাগে, আমি তখন সব তাড়িয়ে, আলো নিবিয়ে অন্ধকারে বসে ভাবি!—কেবল ভাবি!

—তুমি ভাবো দীনবন্ধু?—কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তুমি ভাববার শক্তি বহুকাল হারিয়ে ফেলেচ!...তবে দেখতে পাচ্চি, তোমার দ্বারা এখনো আমার কাজ হবে।

—ভাবি বই কি দাদা—আমি না ভাবতে চাইলেও, বাবা আমাকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে ভাবান—তখন এ সব বন্ধু বান্ধবকে ফেলে, আমি ঘরে কপাট দিয়ে বসে ভাবি—কোথায় নেমে যাচ্ছি—পাতালে,—না, রসাতলে···

—এদের পাল্লায় পড়ে তুমি অধঃপাতে যেতে বসেছ দীনবন্ধু, এস আমার সঙ্গে এস।

একজন মোসাহেব আর না থাকিতে পারিয়া দীনবন্ধুকে মন্ত্রণা দিল—বাবু কচ্চেন কি? ও একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী!—ও আপনাকে গোল্লায় দিতে এসেচে, তা জানেন? আজকালকার দিনে এই সব গেরুয়াধারীকে বিশ্বাস করতে আছে?

—"না হে, উনি আমার বাল্য বন্ধু"—বলিয়া দীনবন্ধু বাণেশ্বরের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তখন বাবুহীন সভার মাঝে মোসাহেব দল পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিতেছিল। একজন বলিল—তাই ত, বাবুকে তুক্ করলে না কি ?—বলিতে বলিতে বুদ্ধিদাতা চাটুকারগণ দীনবন্ধুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

বাণেশ্বর দীনবন্ধুকে নিভৃতে আনিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—দীনবন্ধু, তোমার সদাশয় পিতার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে এসেচি। তোমার দানশীল পিতার আমলে যে লক্ষ্মী-শ্রী এই ভবনে ফুটে উঠেছিল, সে লক্ষ্মী-শ্রী এখন কোথায় ? তোমার ঠাকুর অনেক ভেবেচিন্তে তোমার নাম দীনবন্ধু রেখেছিলেন—তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য। তা না করে তুমি কতকগুলো মোসাহেব পুষ্‌চো—তাদের খেয়ালে পড়ে তোমার পিতৃধর্ম্মকে তুমি জলাঞ্জলি দিচ্চ! এরা তোমাকে মনে মনে এবং পিছনে ঘৃণা করে, কেবল তোমার বিভবের খাতিরে সাম্‌নে তোমাকে 'দীনবন্ধু বাবু' বলে উপহাস করে মাত্র। কাল তোমার ভাণ্ডার ফুরিয়ে এলে তখন এরাই আবার তোমাকে "মিস্ত্রীর ছেলে" বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। তুমি যে সত্য সত্যই মিস্ত্রীর ছেলে এটাই আজ বড় করে প্রকাশ্যে ধরতে শেখ ভাই! এই সব মোসাহেব ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দিয়ে, তুমি আজ যথার্থ দীনের বন্ধু হও—তোমার পিতার কীর্ত্তি বজায় থাকুক।

মোসাহেব দল সেই নিভৃত স্থানেই উপস্থিত হইয়া সমস্বরে বলিল—বাবু, আপনার সাম্‌নে কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানদের অপমান! আপনি এই, ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথায় 'বোকা' হয়ে রইলেন যে!

বাণেশ্বর কহিলেন—কেন বাবু, আমাকে তোমরা দরোয়ান দিয়ে

গলাধাক্কা খাওয়াবে না কি? তোমাদের কুলীনত্বের আস্ফালন যে মোসাহেবীতেই মারা গিয়েচে! এইবার তোমরা যে যা'র রাস্তা দেখ, আমি দীনবন্ধুকে আবার 'বাবু' নাম কাটিয়ে 'মিস্ত্রীর ছেলে' কর্‌তে এসেচি!

একজন ভীষণ রাগ করিয়া জানাইল—বাবু, আপনারও অপমান! আপনি মিস্ত্রীর ছেলে!—এ-কথা বলতে ওর মুখে বাধ্‌লো না!

বাণেশ্বরের মোহিনী উপদেশ-বাণীতে দীনবন্ধুর মনে অনুশোচনা আসিতেছিল। সে যে এতকাল অন্যায়ের পূজা করিয়া স্বর্গীয় পিতৃ-আত্মার অবমাননা করিয়াছে, তাহা এতদিন পরে আজ সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল,—হঁ্যা, আমি মিস্ত্রীর ছেলে। বাবু নই, সামান্য মিস্ত্রীরই ছেলে!...আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—এতদিনের পর আমার শরীর যেন হাল্‌কা ঠেক্‌চে—মন থেকে যেন আজ একটা পাথর নেবে গেল!—বাণেশ্বর দা, তুমি আজ আমাকে সত্য সত্যই পুনর্জ্জন্ম দিলে! দাঁড়াও, আমি এখনি আস্‌চি—বলিয়া দীনবন্ধু টলিতে টলিতে তাহার পিতার পূজা-গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই পূজা-গৃহে তিনু মিস্ত্রী ব্যতীত তিনু মিস্ত্রীর সবই বর্ত্তমান ছিল—সেই মোটা তুলসীর মালা, সেই আট-পৌরে কাপড়গুলা—সেই ফতুয়া—সেই নামাবলী!

দীনবন্ধু পোষাকী যাহা-কিছু ফেলিয়া আবার তাহার পিতার মত আট-পৌরে বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিয়া বলিল,—সত্যই আমি আজ মিস্ত্রীর ছেলে।

কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা এইবার ব্রহ্মশাপ দিতে দিতে সহস্র গালি পাড়িতে পাড়িতে যে যাহার পথ ধরিল। রহিল কেবল বাণেশ্বর ও ভবেশ। কর্ম্মের বেণু-রবে আবার দীনবন্ধু আপনাকে আপনার কাছে ফিরিয়া পাইল। নকল ব্রাহ্মণ যত বিদায় লইল—এখন হইতে সেই

শূদ্রের জীবনে আসল ব্রাহ্মণ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। একটা জড় পাষাণের মধ্যে জাগ্রত ভগবানের আজ সাড়া পড়িল। দরিদ্র-নারায়ণের বেশে ভগবান আবার দীনবন্ধুর পূজা লইতে স্বীকৃত হইলেন। যেখানে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঠুংরি ও টপ্পার মজ্‌লিস চলিতেছিল, সেখানে এখন ভাবুক ভবেশ বিশ্ববেদনাকে বরণ করিয়া গাহিল—

"আজ জয়-পরাজয় ঘুচিয়ে দিতে নিয়ে ভাবের ঝুলি,
দাঁড়িয়েছি এই মাঝপথে ভাই, মেখে পথের ধূলি!
কান পেতে আজ পেয়েছি কা'র অসীম হ'তে সাড়া,
ঘরে-পরে উঠেছে তাই সীমার মাঝে তাড়া,
তাই ব্রজের পথের পদরজ মাথায় নিছি তুলি!"
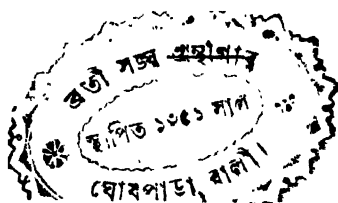
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রচিত জাল

দক্ষিণেশ্বরে সুলোচনার স্বামী বিমলের একহারা একতালা কোটা-ঘর। সেবারের ভূমিকম্পে ফাটল ধরিয়া জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ছাদ হইতে বর্ষার জল পড়ে—দেওয়ালে নোনা ধরিয়া নিত্যই চূণ-বালি খসিয়া পড়ে—মেরামত করা আর ঘটিয়া উঠে না। দারুণ অভাবের সংসার—সেই অভাবের মধ্যেই বিমল কোদালী পাড়িয়া কলাগাছের গোড়ায় পুকুর হইতে পাঁক তুলিয়া দেয়—কাগজী লেবু-গাছটার পোকা বাছিয়া প্রাণ রক্ষা করে, বেগুন গাছগুলার গোড়া আল্‌গা করিয়া দেয়—মানগাছের গোড়ায় নিজেই ঝুড়ি করিয়া ছাই ঢালিতে অপমান বোধ করে না। এত গুছাইয়াও বিমলের দক্ষিণে আনিতে বামে কুলায় না। মাথার উপর বৃদ্ধ-অন্ধ মা, সুযৌবনা স্ত্রী ও একটি সবেধন নীলমণি পুত্রের ভার। তাহার উপর ছেলে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডাক্তারী পড়া—এ বৎসর আবার শেষ পরীক্ষা!—বিমল তজ্জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল।

ঘরে চাউল বাড়ন্ত—এ-সুসমাচার বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী সুলোচনা অতি কষ্টেই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ভাণ্ডারের সঙ্গে ভণ্ডামী চলে না—এ-বেলা না আনিয়া রাখিতে পারিলে ও-বেলা উপবাস করিতে হইবে!—কি যে করিবে, সুলোচনা ভাবিয়া পাইতেছিল না—একবার

ভাবিতেছিল,—সতী-পিসীর কাছে যাই—আজিকার চালটা ধার করিয়া আনি। পাড়ার গোয়ালিনী সতী-পিসীর গরু আছে—সুলোচনা গোপনে গরুর খড় কাটিয়া দিয়া পুত্র সুশীলের জন্য দুধ যোগাড় করে।

এমনি সময় বিমল আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মনটা আজ এমন ভারি যে, সুলোচনা?

—না, কিছু না, ছেলেটা কোথায় পথে পথে ঘুরচে!—সুলোচনা আসল অভাবটুকু প্রকাশ করিতে পারিল না।

—সুলোচনা, আমি ওবেলা থেকে মহেন্দ্রকে খেতে বলেচি। সে একলাটি কেমন উদাস মেরে যাচ্চে। তা ছাড়া জানোই তো, সময় অসময়ে সে আমার কত উপকার করেছে, এখনো করছে!—

বিমল কথাগুলি জলের ন্যায় বলিয়া গেল বটে, কিন্তু সুলোচনার তাহাতে আরও মাথা ঘুরিয়া গেল। অতীতদিনের স্মৃতির বেদনা আসিয়া তাহার চিত্তকে আড়ষ্ট করিয়া দিল। তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

—তোমার এতে কি কোন আপত্তি আছে, সুলোচনা? মহেন্দ্র আমার সহোদর অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ! এতটা উপকার এ-জীবনে আর কার কাছে পেয়েছি, বলো?

—"ওগো, সেজন্যে নয়—ঘরে যে চা'ল বাড়ন্ত।" অতি কষ্টে ঢোক গিলিয়া সুলোচনা কথাগুলি বলিল।

—সে জন্যে ভাবনা কি?—মহেন্দ্র পাঁচখানি দশটাকার নোট দিয়ে এ-যাত্রা আমাকে রক্ষা করেছে।—তা না হলে পাশ করাও আমার পক্ষে দায় হ'ত। তুমি এখন থেকে সব যোগাড় করে রাখ,—আমি চাল-ডাল তরকারী—সব এনে দিচ্চি।

অপর-কক্ষে অন্ধ বৃদ্ধা-মা বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। বিমল অগ্রসর হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন মা, মহেন্দ্রকে

এখানে খেতে ব'লে ভাল করিনি ?—সে আমার কত-বড় বন্ধু। আজও আমি তার কাছে অশেষ উপকারে ঋণী।

বৃদ্ধা জবাব দিলেন—এখনও কি তোর জ্ঞান-বুদ্ধি হ'ল না বাবা ? তোর সোমত্ত-বৌ ঘরে থাকৃতে, তুই খাল কেটে কুমীর এনে ঘরে ঢোকাবি ?

—মা, তুমি জান না মহেন্দ্রের মত উপকারী আমার আর কেউ নাই। অভাবের তাড়নায় আমার ভবিষ্যৎটাও হয়ত মাটি হয়ে যেত—কিন্তু মহেন্দ্রই আমাকে বাঁচিয়েছে ! তাকে আমরা ছুটো রেঁধে দিয়েও সাহায্য করতে পারবো না ? আর যখন নিজেই মুখ ফুটে বলে ফেলেচি, তখন প্রাণ থাকতে তা'কে কখনই বারণ করতে পারব না।

"তবে যা-ইচ্ছে করগে বাপু। আমি যখন দু'চোখই হারিয়ে ব'সে আছি, তখন তোদের কোন কথাতেই এ বয়সে আর থাকৃতে চাই না"—বৃদ্ধা আবার হরিনামের ঝুলির ভিতর হাত পুরিলেন।

সুলোচনা মহেন্দ্রের এ-সব সাহায্যের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিত। কেন যে মহেন্দ্র এত স্থান থাকিতে দক্ষিণেশ্বরের তাহার শ্বশুরালয়ের পার্শ্বেই আস্তানা লইয়াছে—ইহা সুলোচনার অবিদিত ছিল না। তাড়াতাড়ি তাহার শেষ সম্বল একটি সোনার হাঁসুলী বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—দেখ, এই হাঁসুলীছড়াটা বাবা মরবার সময় সুশীলকে দিয়ে যান্—ছেলের গলার সামগ্রী ব'লে আমি এতদিন তোমাকে বাঁধা দিতে দিইনি—মার প্যাঁট্‌রার মধ্যে এটা একরকম লুকোনই ছিল। এই নাও, এইটিতে এখনকার মত চালাও, আর যা' তার কাছ থেকে এনেছ, এখনি ফিরিয়ে দিয়ে এস।

হাঁসুলীটা ধরিয়া বিমল ব্যথিত হইয়া বলিল—তা' হলে যে সে বড়ই হীন ভাব্‌বে, সুলোচনা !

—"তবে তোমার যা-ইচ্ছে তাই করো!"—বলিয়া সুলোচনা তফাতে গিয়া দাঁড়াইল।

—আচ্ছা, হাঁসুলীটা এখন রইল—আমি ফিরে এসে যা হয় একটা ঠিক করবো—আজকের মত তুমি আমার মান রক্ষা করো।

বিমল বাটীর বাহির হইয়া গেল। সুলোচনা দালানের সিঁড়িতে বসিয়া গালে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল :—

—এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার রক্ষক স্বামীও আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তে চাইলো না। হায়, এমন ভোলা-মহেশ্বর হ'লে তোমার চল্‌বে কেন? তুমি ভাবো তোমার মতই বুঝি সবাই দেবতা হয়ে জন্মেচে! আজন্ম এ পর্য্যন্ত তুমি মানুষ চিন্‌লে না! তুমি বলো, মহেন্দ্র তোমার উপকার করে! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো না, দেখ্‌তে পাচ্চো না, তোমার উপকার কেন সে করে? আমারই সর্ব্বনাশের জন্যে···আমারই জন্যে সে দেশ ছেড়ে সাধ্বী স্ত্রীকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তোমার পাশে এসে বসেচে। তুমি আমার স্বামী—তুমিও তার সহায় হয়েচ—এক মহা বিশ্বাসঘাতককে প্রকৃত বন্ধু বলে ঠাউরেচ! এ ভুল তোমার ভাঙতেই হবে; তা না হলে এই প্রথম ভুলে অনেক ভুলই হয়ে যাবে! আজ সব কথা তোমার পায়ে ধরে খুলে বলবো। মহেন্দ্র আমার কে? আমি কিন্তু তার সুমুখে কখনই বেরুতে স্বীকার করবো না—ভাতের থালা আমি এগিয়ে দিতে পারবো না। খাবার ফন্দী ক'রে বসে—আর কা'কেও নয়, আমাকেই সে খেতে আস্‌চে।......

বাজার হইতে ফিরিয়া বিমল সুলোচনাকে বলিল—দেখ, আর কিছু আনতে হবে কি না। মাছ এনেছি—একসের। পটল, আলু—কুমড়ো··· আর কিছু চাই?···ও-বেলায় দই-সন্দেশ আনলেই হবে। আজ প্রথম

দিন, তাই একটু ভালোরকম আয়োজন করা গেল। কাল থেকে আমরা যেমনই খাই, সেও তেমনি খাবে।

সুলোচনা মুখে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মনে মনে বলিল—দই-সন্দেশ—কোনো কিছুরই সে ভক্ত নয়। নুন-ভাত দিলেও সে এই দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে। আমার এই মগজের ঘি'টুকুর চাইতে তার কাছে লোভের জিনিস আর দুনিয়ায় নাই।···কিন্তু হে ভগবান্!—আমি তোমার কি করেছি? আমাকে পিশাচের মুখদর্শন করবার পাপ থেকে আজ রক্ষা করো ঠাকুর! আর আমি কিছু চাই না।
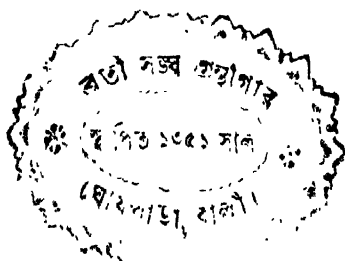
সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বামী-তীর্থ

মহামায়া কতদূর অগ্রসর হইল, সুষমাই বা কোথায় গিয়া পড়িল, তাহাই এইবার আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব। মহামায়ার বৈরাগ্যময় জীবনে আজ স্মৃতি ও দর্শন এক হইয়া গিয়াছে। অচির-কাল মধ্যেই মহামায়া এক অভূত-পূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাপের বাড়ীর পাট উঠাইয়া দিয়া নবদ্বীপে স্বামীর ভিটার উপর আজ তাহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—'স্বামী-তীর্থ'—বাস্তবিকই এক সাধনার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! মহামায়া এখন প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী। স্বামীর নশ্বর দেহখানাই আজ তাহার ধ্যানের বস্তু নহে, স্বামীর মহামানবতার ক্ষেত্রকেই আজ মহামায়া জীবনের সার ব্রত করিয়াছে—নিজের স্বাধীন বুদ্ধিতে কেবল মাত্র স্বামীর মহতী প্রেরণাকে লক্ষ্য করিয়া।

সুষমাও এখন আর সেই নীরব কাঠের পুতুলখানি নাই—সুষমার জীবন পরীক্ষার সোপানে-সোপানে বর্দ্ধিত হইয়া আজ জগৎ-স্বামীর পদতলে বিলীন হইতে চলিয়াছে।

জগতে এমন ব্যথা নাই, যেখানে সুষমার সান্ত্বনা অতি-আগ্রহে গিয়া পড়ে না—এমন অশ্রুজল নাই, যাহা দরদিনী সুষমার অঞ্চলের অপেক্ষা করে না।

বুড়া কৈলাসও কেবল সন্তুকে লইয়াই ভৃত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখায় না, সে আজ যুবকের অপেক্ষাও দ্বিগুণ উৎসাহে বিশাল মানবতার

সেবাপরায়ণ হইয়াছে। তাহার নীরব দানের মূল্য কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারে না। সে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে, বর্ষার জলে ভিজিতে ভিজিতে, পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কোথাও বা পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার করে, কোথাও বা ঘরামী হইয়া ঘর ছাইয়া দেয়, কোথাও বা অনশন-ক্লিষ্টদিগকে মহামায়ার মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া আসে। সে নমোশূদ্র বাছে না—হিন্দু-মুসলমান বিচার করে না—হাড়ী-বাগ্দী দেখিয়া ঘৃণায় নাক সিট্‌কায় না। কৈলাস অতি-বড় এক-ঘ'রেকেও হৃদয়ের উপর অভিন্ন ধর্ম্মে ধরিয়া রাখে।

কিন্তু বিরজা কোথায়? সেই হিমালয়ের আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী বিরজার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। সে পাগলিনীও বটে—ভিখারিণী ত বটেই। কেবল সঙ্গীত আর ইঙ্গিতেই তাহার দিন চলে। বিরজা সদরেও থাকে মফঃস্বলেও থাকে। পচা নর্দ্দমাকে অন্বেষণ করিয়া তাহার আবিলতা দূর করে, কোথাও বা স্বর্গের মন্দাকিনীর ন্যায় লীলায়িত গতিতে বহিয়া যায়! কোথাও বা অন্তঃ-সলিলা ফল্গুর ন্যায় অনুর্ব্বর মরু-প্রদেশকেও শস্য শ্যামল করিয়া তোলে। কেহ তাহার সন্ধান পায় না—অথচ সে ত্রিভুবনের সন্ধান রাখে—তারায় তারায় খোঁজ নেয়! যখন সে সহরে প্রবেশ করে, তখন তাহাকে আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে হয়,—সহরের ময়লা-ফেলা টব হইতে মেথ্‌রাণীর আঁস্তাকুড় হইতে জন্ম-অপরাধীদিগকে উদ্ধার করিয়া আপনার বুকে রাখে—আর মহামায়ার স্বামী-তীর্থে যোগদান দেয়—আবার দূরে—আরও দূরে চলিয়া যায়। বিরজা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল কর্ম্মকেই খোঁজে—আর সময়ে সময়ে মহামায়ার রসদ যোগায়।

আজ, স্বামীতীর্থের সাম্বৎসরিক উৎসব। মহামায়া সন্ধান পাইয়া

বাণেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বাণেশ্বরও ভবেশ ও দীনবন্ধুকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। নিজের জন্মক্ষেত্রে বহুবর্ষ পরে বাণেশ্বর পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মহামায়ার অনাথ-মন্দির অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাণেশ্বর সর্ব্বাগ্রে তথাকার পদধূলি নিজের কপালে ছোঁয়াইলেন। আশ্রমের বালক-বালিকাগণ তাহাদিগের আশ্রম-পিতাকে আজ চাক্ষুষ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিল—বালক সন্তু তাহাদিগের অগ্রণী হইল। আশ্রম-শিক্ষয়িত্রী অপূর্ব্ব মহিমাময়ী সুষমা প্রথমেই অনাথ বালক-বালিকাদিগকে তাহার রচিত অভিবাদন-সঙ্গীতটি গাহিতে ইঙ্গিত করিল।

আম্রপত্র-মণ্ডিত আশ্রম সম্মুখ হইতে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত উত্থিত হইল—

"আমাদের পানে চাহে না কেহ গো, মোরা পতিত সকল কাজে,
ঘৃণ্য বলিয়ে যায় গো ফেলিয়ে—একা এ পথের মাঝে—"

বাণেশ্বর ভবেশকে বলিলেন—ভবেশ, এই তো তোমার কল্পিত 'সন্ন্যাসীর সংসার'—যা বারাণসীর জলে একদিন বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলে?... কিন্তু এ আশ্রমের নাম স্বামী-তীর্থ কেন হ'ল ভবেশ? এ যে সতীর স্বর্গ, জগজ্জননী আদ্যা-শক্তির পীঠস্থান—অন্নপূর্ণার অন্ন-মেরু! এতে আমার মত বৃক্ষতল-শায়ী ভিখারীর সংস্পর্শ কেন? মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—এইখানেই তুমি একটা মস্ত ভুল করেছ, মহামায়া!

মহামায়া করযোড়ে বলিতে লাগিল—প্রভু, আমি সব মোহ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে আপনারই জন্ম-কুটিরকে মন্দিরে পরিণত করেছি। তা না হ'লে যে আমার ভিখারী-দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না! তাই তো আমি এই অপূর্ব্ব নাম দিয়ে আমারই পূজার সাধ মিটিয়েছি। এই সব অনাথ ছেলে মেয়ে, চোখে না দেখ্‌লেও তারা আপনাকেই আশ্রমের পিতা ব'লে জানে।

—মহামায়া, তোমার উপর আমি আশাতীত ভাবে সন্তুষ্ট। কেবল এই ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীর সংস্রব মুছে ফেলে দিয়ে, সীমাবদ্ধ মানুষের পূজা উঠিয়ে, সব আত্মাশক্তি অনন্তরূপিণী মা'র চরণে সমর্পণ করে দাও!

মহামায়া তাহাতেও যেন সন্তুষ্ট না হইয়া নিবেদন করিল—কিন্তু এই মন্দিরকেই আমি আপনার পরম বিগ্রহ জ্ঞানে সেবা করে থাকি। আপনার বিন্দুমাত্রও সংস্রব না থাক্‌লে যে আমি প্রেরণা হারিয়ে ফেল্‌বো! আপনিই আমার গুরু! সতীর পতি ছাড়া অন্য কোন দেবতা নাই···কই, ভগবানকে ত এখনও চিন্‌লুম না আমি!

মহামায়ার এই বিশ্ব-বিজয়িনী উক্তিতে দীনবন্ধু এক অপার কর্ম্ম-শক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জানাইল—মা, ধন্য তোমার স্বামী-ভক্তি! কবে তোমার মত বাংলার সমস্ত নারী ত্রিনয়নে চাইবে—সতীত্বের উজ্জ্বল মহিমায় তোমারি অক্ষুণ্ণ আদর্শের অনুসরণ কর্‌বে?···মা, তুমি সন্তানের মোহ-নিদ্রা আজ ভেঙ্গে দিলে। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তোমার শক্তিকে প্রেরণা দাও মা—আমরাও এই দণ্ডে সেবার বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ি!

মহামায়া এক অপূর্ব্ব করুণার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

বাণেশ্বর বলিলেন—মহামায়া, এরা আমার কর্ম্মের প্রসারিত বাহু। এদের নিয়ে আমি এই বিপুল তরঙ্গে এবং অনায়ত্ত জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েচি। আমি সব সময়ে আস্‌তে না পারলে, এরাই তোমার আশ্রমের অভাব দূর কর্‌বে—এদের তুমি 'পর' ভেবো না। তুমি আহ্বান করলেই এরা তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হবে।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কর্ম্মক্লান্ত কৈলাস ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার বড় সাধের জামাইবাবু আজ সত্য সত্যই নিজেই আসিয়া ধরা দিয়াছেন! বৃদ্ধ রসিক করযোড়ে আনত হইয়া বলিল, পেন্নাম

হই।গো জামাইবাবু! ভাগ্যিস্ আজ তোমার পায়ের ধুলো আপনা হতেই পড়লো!

তারপর গামছায় কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—দে তো মা, একটু গুড় আর এক ঘটি জল—অনেক তেতেপুড়ে এলুম, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

মহামায়া একঘটি জল, বড় থালায় করিয়া এক-রেক মুড়ী, গণ্ডাপাঁচ ছয় নারিকেল-নাড়ু ও গোটা চার-পাঁচ কলা আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিল।

বৃদ্ধ 'জল-পান' উদরসাৎ করিতে করিতে তাহার জামাইবাবুকে দেশের অবস্থা জানাইতে আরম্ভ করিল—বাবু গো, যে কাজে তুমি লাগিয়েছ, তা কি সামান্ডি এই ক'টা লোকের কাজ? দেশের লক্ষ হাত না হ'লে দেশের দুঃখু কখনও ঘুচবে না। দিবা রাত্র মেহনৎ করেও মানুষের দুঃখের আগুন নেবাতে পাচ্ছিনি! আমার তিন মেয়েতে যে কেমন করে চালাল, তা আমিই ভেবে উঠতে পারি না। মহামায়া-মা রাঁধেন, সুষমা-মা লেখা-পড়া শেখান, আর বিরজা-মা মেগে-পেতে আনেন।

বাণেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল্‌লে কৈলেস? বিরজা! বিরজা তবে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছে? তোমরা বিরজাকে আমায় একবার দেখাবে? অনেককাল তাকে দেখিনি।

মহামায়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু বিরজাকে আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?

—"বিরজা আমার সহ-তীর্থা—তাহাকে আমার যমজ ভগ্নী বলেই মনে হয়, মহামায়া। সে যে কি বস্তু, আজও আমি ধারণা করতে পার্‌লুম না।" বলিয়া বাণেশ্বর একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

মহামায়া জানাইল—আমরাও তার কূল-কিনারা পাইনি। সে সব করে, অথচ কিছুতেই যেন লিপ্ত নয়—যেন কি-এক রকম।

—বিরজাকে বুঝ্‌তে পার্‌বে না মহামায়া,—সে পর-পারে থেকে এ-পারের কাজ করে যায়। ধূমকেতুর মত কোথেকে আসে, কোথায় যায়, জগতের লোক তার সন্ধান পায় না। অথচ সকলের নাড়ী-নক্ষত্র বিরজার নখ-দর্পণে!—বাণেশ্বর অপার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন।

কৈলাস জানাইল—ও একটা আগুন-খাকী মেয়ে, বাবু। মাথায় যেমন টক্‌টকে সিঁদুর, চাঁপাফুলের মত গায়ের রং টক্‌-টকে, তেম্‌নি নিটোল চেহারা।—তার উপর আবার গেরুয়া! ভুবনমোহিনী মাকে আমার দেখ্‌লে যমরাজও পেছিয়ে পড়ে, মানুষ ত' কোন ছার!—এত বড় আশ্রমটার যা শোভা দেখছো বাবু, এর মূলে আছে সেই বিরজাবেটীর সোনার হাতের পরশ!

এই বর্ণনার মাঝখানে একটি প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। ভবেশ যেন কোন্‌ অতল-রাজ্যে তলাইয়া যাইতেছিল। একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার তাহার কল্পনা-প্রবণ কবিচিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা মনে আসিয়াও মুখে ফুটিতেছিল না। বিরজা-নামে তারও যে একটি মায়ের সেরা মা ছিল—কিন্তু কোথায়, কত দূরে ফেলে-আসা সেই স্নেহ-দৃষ্টি!

ভবেশ পাগলের ন্যায় জানাইল—প্রভু, কে সে সন্ন্যাসিনী?—তাঁর নাম শুনে অনেক কালের একটা হারানো স্মৃতি এসে যেন আমাকে ঘিরে ফেলেচে! একবার আমাকে দেখাবেন কি? তিনি যেই হোন্‌, আমি তাঁকে 'মা' ব'লে ডেকে আমার মা-বলার সাধ মিটিয়ে নেবো।

বাণেশ্বর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বৎস, সময় এলে সে নিজেই এসে আমাদের ধরা দেবে। তার কাজ এখনও ফুরোয়নি—তাই সে উধাও হ'য়ে পথে-পথে কাজের পশ্চাতেই ফিরচে।

বাণেশ্বরও যে আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছেন—সুষমাই তাহার একমাত্র কারণ। সংসারের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে তিনি দুইটি ছেলে-মেয়ের মায়াপাশে যেন আপনা হইতেই বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার যাত্রাপথের প্রথম আকর্ষণ হইতেছে, পুত্র-প্রতিম ভবেশ—আর দ্বিতীয়টি হইতেছে কন্যাসমা সুষমা! সন্ন্যাসী হইয়াও এই দুইটি বস্তু তাঁহাকে সংসারের পথে বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছে! বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ নিগৃহীতা অপমানিতা হৃতসর্ব্বস্বা সুষমার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাঙ্গালীর জীবনে আজ যদি কোন ভাবনার বিষয় হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে নিরীহ মাতৃজাতির এবংবিধ অপমান। নিরীহের নিগ্রহে ও প্রকৃত অপরাধীর নিষ্কৃতিতে বাণেশ্বর আজিও যেন বিদ্রোহী নাস্তিকের ন্যায় ঘুরিতেছেন।

বাণেশ্বর আজ সদলবলে আসিয়াছেন, তাঁর নিগৃহীতা কন্যা সুষমার স্বহস্ত-পরিবেশিত প্রসাদ গ্রহণ করিতে। সুষমা আপনাকে হীনা-দীনা অতি ঘৃণার সামগ্রী ভাবিয়া যেন জগতের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিত। এত যে কর্ম্মের ঐকান্তিক প্রেরণা—বিরজার বিপুল আয়োজন, আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী হইয়াও—দায়িত্বের সব ভার পাইয়াও—সেই প্রসাদপুরের কথা, রেলের অত্যাচার, হাসপাতালে অবস্থান, স্বামীর পরিত্যাগ, এমন কি সমাজ-ভয়ে বাপ-মারও মুখ ফিরাইয়া লওয়া, সেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার অবস্থা, সেই মহামায়ার দ্বারদেশে সতৃষ্ণ নয়নে আশ্রয়-ভিক্ষা,—সূচিকার ন্যায় প্রতিনিয়ত সুষমাকে পলে-পলে বিঁধিত। সে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে—ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইত না।

বাণেশ্বর সেই ম্রিয়মানার অবনত দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—মা, অতি-বড় বুভুক্ষু আমরা। চল মা অন্নপূর্ণা, আমাদের প্রসাদ দেবে চল। এ মন্দিরের আসল পূজারিণী যে তুমিই! যা'রা কিছু হারায়নি—তা'রা তোমার মত হৃতসর্ব্বস্বার দুঃখ ত' বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমি যে

তা'র কিছু কিছু বুঝেছি মা,—তাই এত দূর-পথ হ'তে কেবল তোমারি সম্বর্দ্ধনার জন্য তোমারি কাছে ছুটে এসেচি।

—বাবা, এত লোক থাকতে আপনি আমার হাতে খাবেন? আমি যে তৃণের চেয়েও নীচ বাবা। আমাকে স্পর্শ করলেও, আমার ছায়া মাড়ালেও যে বাংলা দেশের জাত যায়!

ছল-ছল-চক্ষু বাণেশ্বর কহিলেন—কিন্তু মা, আমিও যে তোমার এক-ঘরে' ছেলে! তোমারি মত আমারও জাত যে অনেক দিন হ'ল চলে গেছে! আশ্রমের এই জাত-হারাদের নিয়েই আমি আজ এমন জাতে উঠ্‌তে চাই—যাতে এই বাংলাদেশের একপ্রান্ত হ'তে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত যেন সব একাকার হ'য়ে যায়।
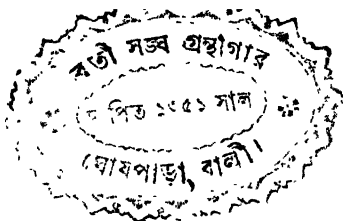
অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপরাধিনী

রূপোন্মাদ মহেন্দ্র সুলোচনাকে কোন মতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না। বিমলের পুত্রের মুখখানি, সেই মধুমাখা মুখখানির আধ-আধ 'জ্যাঠাবাবু' বুলিও মহেন্দ্রের রূপ-তৃষ্ণাকে দমন করিতে পারিল না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, গ্রহণের রাহুর ন্যায় সে কেবল সুলোচনাকে গ্রাস করিবার নিত্য অবসর খুঁজিতে লাগিল।

মহেন্দ্র দুই বেলাই খাইতে আসে। বিমলের অসাক্ষাতেও আসে, আর তিল-তিল করিয়া সুলোচনাকে খাইয়া যায়। সুলোচনা সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু স্বামীকে মহেন্দ্রের কোন আচরণই বলিতে সাহস করে না। ভাবে—তিনি কি মনে করিবেন, তাঁর যে মহেন্দ্রের উপর অসীম অনুরাগ, অকপট বিশ্বাস! হয় ত কিছু বলিয়া ফেলিলে, স্বামীই তাহাকে অপরাধিনী ভাবিবেন।

মহেন্দ্র পশু-প্রকৃতি দানব, বিমল শুদ্ধস্বভাব দেবতা, আর সুলোচনা দেবত্ব ও দানবত্বের মধ্যস্থলে সংপতিতা দুর্ব্বলা মানবী! তাই সুলোচনা সেই নির্ম্মলচরিত্র দেবতার চরণতলে আত্ম-নিবেদন করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসে, আর দানবের নির্ম্মম হস্তে লাঞ্ছিতা হইয়াও নীরবে সকল জ্বালা সহ্য করে।

আজকাল বিমল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া পরীক্ষার পড়া

সুখস্থ করে, সুলোচনা পুত্রকে লইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সেদিন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে—তখনো বিমল ঘুমায় নাই।

সুলোচনা স্বামীকে বলিল—তুমি এখনও ঘুমোওনি! রাত যে ভোর ক'রে দিলে!—সেই ন'টা থেকে বসেছ—এমন ক'রে শরীরটাই যে মাটী করে ফেল্‌বে!

বিমল হাসিয়া কহিল—শরীরটার চেয়ে পরীক্ষাটাই যে আমার চক্ষে আজ বড় সুলোচনা।...এ রাত-জাগা কেবল তোমাদের জন্যেই সুলোচনা,—তোমাকেই সুখী করবার জন্যে! বিয়ে করা অবধি তোমাকে সুখী কর্‌তে পাল্লুম না, আমার এই সব চেয়ে বড় আক্ষেপ! কি করবো, দারিদ্র্য যে আমার মজ্জাগত অপরাধ!—নিতান্ত অক্ষম আমি, তোমার মত লক্ষ্মীকে ঘরে এনে দিবারাত্রি কষ্ট দিই,—তুমি যে এতবড় সংসারের খরচ কেমন ক'রে চালাও, সকল সময় তারও খোঁজ রাখ্‌তে পারি না। তোমার গয়নাগুলোও একে একে খেয়ে শেষটায় কাঁচের চুড়ি দিয়ে তোমার স্বামী-সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সম্মান দিয়েছি।

—ভয় কি, তুমি পাশ করো, যা গেছে আবার তা ফিরে আস্‌বে, আর তুমিই যে আমার এক মস্ত অলঙ্কার!...এস, ঘুমুবে এস। সারা রাতটাই জেগেছ!

বিমল ঘুমাইতে গেল—দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়াও পড়িল। কেবল ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না অপরাধিনী সুলোচনা।

সুলোচনা মহেন্দ্রকে কেন যে পূর্ব্বের ন্যায় হীন পিশাচ ভাবিতে পারে না—কেন যে বাল্যস্মৃতির এক-একটা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া তাহার অন্তর-সমুদ্রে দোল দিয়া যায়—মহেন্দ্রের বর্ত্তমান সুষ্ঠু আচরণের সহিত সে-স্মৃতির যেন কোথায় সহানুভূতির সুনিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে—

সুলোচনা তাহা চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারে না—দিবানিশি অশান্তির জ্বালায় জ্বলিয়া সারা হয়।

এক-এক সময় ভাবে, স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলি, মহেন্দ্রকে অপমান করিয়া না হউক মিনতি করিয়া এবাড়ী আসিতে নিষেধ জানাই, —কিন্তু অন্তরে আসে ভীষণ দুর্ব্বলতা—সুলোচনা মহেন্দ্রকে দেখিলেই অনেক সময় অন্তরের গ্লানির কথা ভুলিয়া যায়। ভাবে, যেমন চলিতেছে চলুক—আমি নিজে ঠিক থাকিলে কাহাকে ভয়!

এমনি ভাবেই দিন চলে। রাত্রি জাগিয়া বিমল পাঠাভ্যাস করে, মহেন্দ্র নিয়মিত খাইতে আসে, সুলোচনা অন্ন পরিবেশন করিয়া মহেন্দ্রের মুখপানে অনিমেষে চাহিতে চাহিতে মনের সঙ্গে লড়াই করে। মহেন্দ্র কখনো সুলোচনাকে সহানুভূতির কথা শুনায়···কখনো বা কৌতুক উপহাস করে, আবার কোন কোন দিন নানা অছিলায় মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আনিয়া উপহার দেয়! সুলোচনা 'না' বলিতে পারে না, কিন্তু সে উপহার গ্রহণ করিবার সময় তাহার হাত দুখানার সঙ্গে অন্তরও কাঁপিয়া উঠে।

সুলোচনা বুঝিতে পারে—অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পাপ-মন হয়তো আর ফিরাইবার নয়।—মহেন্দ্রই তার কাল—এ-কথা একদিন সুষমাকে সে বলিয়া গৌরব বোধ করিয়াছিল—আজ সেকথা ভাবিয়া তাহার হৃদকম্প উপস্থিত হয়, মহেন্দ্রের প্রভাব সে কোন প্রকারেই এড়াইতে পারে না।

মহেন্দ্র ভাবে—কাজ হাঁসিল করিবই—একটা নারীর মনে দাগ বসাইতে কতক্ষণ!

৯

গত তিন চার দিন হইতে সুলোচনার মনটা বড়ই চিন্তাকুল হইয়া

আছে। সপ্তাহকাল ধরিয়া সুলোচনার আহার-নিদ্রা নাই। সপ্তাহ যত শেষ হইতেছে ততই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে। মহেন্দ্র সুলোচনাকে সপ্তাহকাল ভাবিতে অবসর দিয়াছে, আজ সন্ধ্যায় তাহাকে শেষ জবাব দিতে হইবে।

কিন্তু সুলোচনার এত যে মানসিক অশান্তি, বিমল তাহার কিছুই টের পায় না—কেবল মহেন্দ্রের আহারাদির সুবিধা হইতেছে কি না, ইহারই সংবাদ লয় মাত্র।

মহেন্দ্র যেদিন বিমলের অনুপস্থিতিতেও খাইতে আসে, সেদিন সুশীল তাহার 'জ্যাঠাবাবুকে' অভ্যর্থনা করে। সুলোচনা অগ্রেই আহার্য্য বাড়িয়া রাখিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়ায়, মহেন্দ্রের যাহা ভাল লাগে, সুলোচনা নিজে না গিয়া সুশীলের হাত দিয়ে পাঠায়,—এই অপরাধে কোন-কোনোদিন মহেন্দ্র দারুণ অভিমান বোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তখন ভীতা সুলোচনা নিজেই অগ্রসর হইয়া অনেক মিনতি করিয়া মহেন্দ্রকে শান্ত করে। বাল্যের কথা মনে পড়িয়া যায়;—মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রসাদপুরের দীঘির জলে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, ফুলপাড়া, নৌকায় উঠা ইত্যাদি সহস্র স্মৃতির আলোড়ন সুলোচনাকে মহেন্দ্রের ছোট-খাট অপরাধগুলার প্রতি লক্ষ্য করিতেই দেয় না। ছেলে-বেলাকার মহেন্দ্র আজও তেমনি ছেলে-মানুষ—এই ক্ষমাই সুলোচনার মনে জাগিয়া রহে!

সুলোচনার দারুণ ঘৃণা ক্রমশঃ এই খাওয়া-দাওয়া—যাওয়া-আসার মাঝে মন্দীভূত হইতেছিল, কিন্তু আজ এক সপ্তাহ হইতে সুলোচনার নিভৃত-রোদনের আর বিরাম ছিল না।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। ভাদ্র মাস, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, পাড়ার পঞ্চানন তলায় আজ মহা ধুম। বাজী পোড়ান হইবে। সুশীল

সেখানে মাতিয়াছে—বিমলও ছেলে পড়াইতে গিয়াছে, কখন ফিরিবে কিছুই বলিয়া যায় নাই। অন্ধ বেতো শাশুড়ী সবেমাত্র অহিফেন খাইয়াছেন। সন্ধ্যা রাত্রে তাঁহার ঘুম অধিক, কিন্তু শেষ রাত্রে তিনি অনিদ্র-প্রহরী!

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুলোচনা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মধু-মালতীর ঝোপে জানালা-পথকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল—তাহার উপর আবার সন্ধ্যার কৃষ্ণ-পক্ষের বিস্তার, কেবল দূরে সতী-পিসীর কুটীর হইতে একটি সন্ধ্যা-দীপ দেখা যাইতেছিল মাত্র। চারিদিকে বাঁশ-ঝাড়, সম্মুখে পানা-ভরা পুকুর, সেই পুকুরের চতুঃপার্শ্বে বুনো-কচু ও বিছুটীর জঙ্গল! ঘরের সংলগ্ন একটা কলিকা-ফুলের গাছ—ফুলে যত মধু, ফলে তত বিষ! সুলোচনা কতবার মনের ধিক্কারে সেই ফলের শাঁস খাইয়া মরিতে গিয়াছে, কিন্তু গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। পাশাপাশি আরও কতকগুলা কৃষ্ণ-ধুতুরার গাছ! মরিবার এমন মণি-কাঞ্চন আয়োজন,—অথচ অভাগী সুলোচনা মরিতে পারে কই?……

কিন্তু এ কি! সন্ধ্যার এই ঘনায়মান অন্ধকারে জানালার কাছে আজ এ কার প্রেত-মূর্ত্তি? সুলোচনার গা'টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল!

মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইল—জানা গেল উহা প্রেত নয়—তবে পিশাচ!

মূর্ত্তি কথা কহিল—সুলোচনা, তুমি আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ? আমি মহেন্দ্র!

ব্যগ্র-মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সুলোচনা বলিয়া উঠিল—যাও যাও, তিনি এখনি এসে পড়বেন!—সুলোচনা জানালার পাশ হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইল!

—কেন, তোমার কি মনে নেই, আজ তোমার উত্তর দেবার শেষ দিন? বল, কি স্থির করেছ?

—মহেন্দ্র, তুমি কি আমাকে পাগল করতে চাও? এতে তোমার কী সুখ, মহেন্দ্র? এদের ভাসিয়ে দিয়ে তোমার কী লাভ? ভাব আমার স্বামী অকপট মুর্ত্তি—আমার পুত্রের সেই সুধামাখা মুখখানা—সেই 'জ্যাঠাবাবু' বুলি! আমাকে পথে বসিয়ে তাদেরই তুমি সর্ব্বনাশ করতে চাও—একি মানুষের কাজ, মহেন্দ্র?

—আমি আজ তোমার জন্যে নরকেও যেতে প্রস্তুত। তাদের অশ্রু-জল ঝরিয়েও আমি তোমাকে চাই—এই দণ্ডেই চাই। তা না হ'লে দেখতে পাচ্চ? এই দেখ।—বলিয়া মহেন্দ্র বুক পকেট হইতে পিস্তল দেখাইল।

—উঃ, কি উন্মাদ তুমি!—ভয়ে সুলোচনা পিছাইয়া গেল।

—না না, তুমি পেছিও না, তোমাকে আমি মারবো না, আমি নিজে মরবো! হয় তুমি, নয় মৃত্যু—একটাকে আজ বেছে নেবো। আমি আজ মরিয়া···কিন্তু সময় নেই সুলোচনা! এই দণ্ডে, এই অন্ধকারেই আমার সঙ্গে দেশান্তরী হতে চাও তো চলে এসো। মমতার টুঁটি চাপা দাও!

—মহেন্দ্র, এ জন্মের মত তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি যোড় হাত করছি, তোমার পায়ে ধরছি, এদের অসুখী ক'রো না। ওই দেখ, আমার উপর দেবতার হুম্‌কী—বিদ্যুতের শানানো অস্ত্র!

ঘন ঘটায় সারা দিবসটাই আচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না। সন্ধ্যার সময়টা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল—আবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল!

—সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যে জন্মান্তরের! এ আকর্ষণ এক জন্মে, কেবল চোখের দেখায় সম্ভব নয়! আমি কি বল্‌বো ওই তোমার দেবতাকেই জিজ্ঞাসা করো। কিন্তু যাতনার ব্যথা বুঝ্‌তে তুমি পারবে না সুলোচনা, কার সাধ্য তোমাকে বোঝায়! যদি সত্যই তুমি

না এসো, দেখ সুলোচনা, এই দেখ, আর পোড়া লোকে দেখুক—তোমাকে কতটা ভালবাসি। বলিয়া মহেন্দ্র পিস্তলের অগ্রভাগ নিজের বুকে ধরিল।

সুলোচনা আরও আতঙ্কে জ্ঞানশূন্যা ও বিবর্ণা হইয়া জানাইল—দাঁড়াও মহেন্দ্র, এতে আমার আরও কলঙ্ক! আমাকেও তোমার মৃত্যুর ভাগী করো—মরতে পারলে পৃথিবীর নিন্দে আমার গায়ে লাগ্‌বে না। তুমি ম'লে, আর আমি বেঁচে থাক্‌লে, এখানে মুখ দেখাতে পার্‌বো না, সকলে আমাকেই দুষ্‌বে। আমিই তোমার পরম শত্রু—এদেরও শত্রু—আমি আছি বলেই ত' এত ঘটনার সৃষ্টি!

এইবার সুলোচনা প্রকৃতই মরিল। মনের ধিক্কারে—জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায়, ক্ষণিক উন্মত্ততার বশে, সুলোচনা চুপি চুপি কপাট খুলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। চুপে—আরও চুপে আসিয়া একাকিনী পুকুরপাড়ে দাঁড়াইল—যেন মহেন্দ্র না জানিতে পারে।

এলোকেশী সুলোচনার আজ এ কি অসমসাহসিক অভিসার! একেবারে যেন স্মৃতির বিলোপ! লজ্জা-ভয় কিছুই নাই—সুলোচনা জ্ঞানহারা দিশেহারা, বাক্যহারা!

মহেন্দ্র চুপি চুপি সুলোচনার অনুসরণ করিতেছিল। কি করে, কোথায় যায়—তাহাই দেখিতেছিল।

সুলোচনা ঝাঁপ দেয় দেয়—এমন সময় মহেন্দ্র পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—তুমি মর্‌তে পারবে না, আমার জন্যে তোমাকে এখনও বাঁচ্‌তে হবে, সুলোচনা। মৃত্যুসংকল্প পরিত্যাগ কর।

—কে তুমি? পশু, পশু! ছাড়্-ছাড়্, আমাকে স্পর্শ ক'রো না, আমি বাঁচতে চাই না। বলিয়া সুলোচনা মহেন্দ্রকে সজোরে এক ধাক্কা দিল। মহেন্দ্রের আকস্মিক স্পর্শে সে বুঝিল, কোন স্বর্গ হইতে আজ সে স্বেচ্ছায়

কত ভীষণ নরকে পা দিয়াছে! যেমনি বুঝিল, অমনি মূর্চ্ছা গিয়া সে মহেন্দ্রের আবেষ্টনের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র কাঁধে করিয়া সেই সংজ্ঞাহীনাকে—একখানা পান্সীতে তুলিল। পান্সী ভাটার টানে গঙ্গার ওপার ঘেসিয়া চলিল। তারপর গঙ্গাবক্ষের সঞ্চালিত মৃদু বায়ুতে সুলোচনার সংজ্ঞা অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল।

—কোথায় আমি? সুশীল কোথায়? তিনি কি এখনও আসেন-নি?

সেই অপরিচিত স্থানে, অন্ধকারে, সুলোচনা যেন চতুর্দ্দিক হাত্ড়াইতে লাগিল। আবার শিহরিয়া বলিল—একি! কোথায় আমি যাচ্চি! এসব কি! কিসের উপর আমি ভাস্চি! আমার চারিদিকে রাশি রাশি তরঙ্গ কেন? কে তুমি?

—আমি মহেন্দ্র।

—কোথায় এনে আমায় ফেলেচ?

—গঙ্গায়।

—আমার সুশীল যে এখনো খায়নি!—আমার ছেলে—আমার স্বামী—তাদের কাছ থেকে এ—তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

—সুলোচনা, অনেক ক্লান্ত হয়েছ, তুমি ঘুমোও।

—কিন্তু এতে কি তোমার ভাল হ'ল মহেন্দ্র?—কাঁদিয়ে তুমি কি সুখী হ'তে পারবে? আমাকে ঘুমুতে বল্‌ছ? আমি শোব, আর তারা সারা রাত ধরে কাঁদবে—আমার সুশীল কেঁদে বিছানা ভাসিয়ে দেবে! ...মহেন্দ্র এখনও আমায় পৌঁছে দাও—আমার দেবতার পায়ে ধ'রে একবার আমার অপরাধের কথা বলি—তার কাছে আমি শেষ-ভিক্ষা চেয়ে আসি!

মহেন্দ্র বধির ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। পান্সী ছুটিল অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা-

পথে—নক্ষত্রগতিতে! বনের পশুপক্ষী—জলের জন্তু-জানোয়ার সুলোচনার দুঃখে অশ্রুত্যাগ করিল—হয়তো তার মনের ক্ষণিক উত্তেজনাকে স্বয়ং ভগবান মার্জ্জনা করিলেন,—কিন্তু পিশাচের পৈশাচিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইল না—মহেন্দ্রের পাষাণ হৃদয় টলিল না।

বিমল ছেলে পড়াইয়া পঞ্চানন-তলায় সুশীলের খোঁজে গেল। তারপর বাজী পোড়ানো শেষ হইলে, সুশীলের হাত ধরিয়া ঘরের দিকে চলিল।

গৃহ-প্রবেশ করিয়া দেখিল, সব অন্ধকার—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নাই! পিলুসুজে কেবল একটি পিতলের প্রদীপ মিটি-মিটি জ্বলিতেছে, আর রাত্রির খাবার সব বাড়া ও ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। গেলাসে জল গড়ানো রহিয়াছে, গাড়ুতে গামছা-ঢাকা পা ধুইবার জল রহিয়াছে, ডিবায় পান সাজা রহিয়াছে। সবই ভরপুর, কেবল গৃহকর্ত্রীর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিখানি নাই! বিমল হারিকেন ধরিয়া এঘর-সেঘর খুঁজিতে লাগিল, বন-বাদাড় সবই খুঁজিয়া ফেলিল, দেখিল কোথাও সুলোচনার ছায়া মাত্র নাই!

বিমল হতাশ হইয়া মাকে জাগাইয়া জানাইল—মা, মা, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে মা—তাকে ত কোথাও খুঁজে পেলুম না!

—বাবা, বাবা, তবে কি মা নেই?—সুশীল তাহার পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমলের বৃদ্ধা মা জিজ্ঞাসা করিলেন—বলিস্ কিরে! বৌ পানা-পুকুরে পা হড়্‌কে ডুবে মর্‌ল না ত?

—সব দেখেছি মা,—কোথাও খুঁজে পাইনি। বলিতে বলিতে বিমল হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, তারপর বলিল—একটা জায়গা এখনো বাকি আছে মা, সুশীলকে তুমি কাছে ডেকে নাও আমি এক্ষুনি ঘুরে আস্‌চি।

কিন্তু দশমিনিটের মধ্যে বিমল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ হয়েচে মা!—যাকে জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভেবেছিলাম, সেই মহেন্দ্রই আমার—

—বাবা খালি মাথা-মুণ্ড লেখা-পড়াই শিখেচিস্, বিদ্বান্ হয়েছিস, ডাক্তার হচ্চিস, কিন্তু রোগ ধরতে পারা তোর কর্ম্ম নয়। সোমত্ত বৌ থাক্‌তে তুই একটা পথের দস্যিকে এনে ঘরে ঢোকাস, তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি আর কবে হবে?

বুড়ী বিমলকে আজ ভৎর্সনার উপর ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

বিমল সুলোচনাকে বড়ই ভালবাসিত—রূপে-গুণে বাস্তবিকই সুলোচনা অতুলনীয়া ছিল। সুগৃহিণী সুনিপুণা সুলোচনা যে কথনও কুলের বাহিরে পা দিতে পারে, ইহা স্বপ্নেও যে ভাবা যায় না! সেই ত সবই সাজানো, একটি একটি জিনিষে সুলোচনার হাত মাখানো। সুলোচনার সবই বর্ত্তমান, কেবল সেই নাই—এ কথা ভাবিতেও বিমলের প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল—আর এ লোকালয়ে নয়, চল মা, এই রাত্রেই চল—তোমার হাত ধ'রে কোন দূর দেশে চলে যাই।

সুশীল জানাইল—বাবা, মা কোথায় গেল? আমার ক্ষিদে পাচ্চে যে!

বিমল পুত্রের জন্য থালার ঢাকা খুলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, একটা দারুণ ঘৃণায় বিমলের মুখটা বাঁকিয়া গেল। সজারুর কাঁটার ন্যায় মাথার চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিল। কার হাতের রাঁধা সামগ্রী ছেলেটাকে খাওয়াতে যাচ্চি—

উঃ, মহেন্দ্র! বিশ্বাসঘাতক! তুমি কি করলে? এই অশ্রুজলের শাস্তি ভগবান তোমাকে একদিন দেবেন।—বলিয়া বিমল দরজা খুলিয়া

বাহির হইতে যাইয়াই দেখিল, খাবারের ঠোঙ্গা হস্তে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি।

—কে···কে আপনি—এই গভীর রাত্রে—

সন্ন্যাসিনী বিরজা সমবেদনার স্বরে বলিল—কোথায় যাচ্চেন? কত রাত হ'ল তার ঠিক রেখেচেন? এত রাত্রে দোকান খোলা পাবেন না।

বিমল সমধিক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি—কে আপনি?

বিরজা পরিচয় দিল—লোকে আমাকে পাগলীও বলে, ভিখারিণীও বলে। আমি যে কে—আমিও তা' ভাল ক'রে জানিনি। যে অবস্থায় যখন থাকি, তখন আমি তাই হয়ে পড়ি। এই দেখুন না, এখন আমি এই ছেলেটার মা হয়ে কেমন মানিয়ে নিচ্চি!—বলিতে বলিতে সুশীলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল ও সুধাইতে লাগিল—বাবা, কি ভাবচিস্? আমি যে তোর সন্ন্যাসিনী-মা! এই দেখ, কেমন তোর জন্যে খাবার এনেচি!

বিমল আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিল—এমন অদ্ভুত ব্যবহার ত' জীবনে কোন দিনও দেখিনি! কি ক'রে জান্‌তে পেরে খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে হাজির হ'ল!

—আপনি অদ্ভুত ভাব্‌চেন? আমার ছেলে, ওর ক্ষিদে পেয়েচে, এই সহজ অনুভূতিটা আর আমি জান্‌তে পার্‌বো না?

বিমল বলিল—অদ্ভুত পাগ্‌লী!

বিরজা তখন সুশীলকে কোলে বসাইয়া—খাবার খাওয়াইতে সুরু করিয়াছে।

বিরজা সাজিয়াছে আজ মা-যশোমতী, আর সুশীল হইয়াছে তার আদরের নন্দদুলাল।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীক্ষেত্রে

সুলোচনা কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। প্রথম আবেগের মুখে, রূপোন্মত্ত মহেন্দ্র সুলোচনাকে লইয়া আজ কাশীতে, কাল বৃন্দাবনে, কভু হরিদ্বারে, কভু শ্রীক্ষেত্রে—বহুস্থান পরিবর্ত্তনে ও পরিভ্রমণে তাহার ভাঙ্গা মনকে বাঁধিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

আজ কয়েকদিন হইতে মহেন্দ্র, সুলোচনা ও তাহার পাপকার্য্যের প্রধান সহায় দাসীশ্রেণীভুক্তা আদুরী নাম্নী এক পিশাচীকে লইয়া পুরীর সমুদ্রতটে একখানি বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে।

সুলোচনা আজ-কাল অহর্নিশি অফুরন্ত কত কথাই ভাবে। জীবনে তার আক্ষেপের আর অবধি নাই। মহেন্দ্র যে পূর্ব্বের মত তাহাকে আর ততখানি আদরের সামগ্রী ভাবে না—ইহা সুলোচনা বুঝিতে পারিয়াছে।

সেদিন নির্জ্জন ঘরে—বিনিদ্র অবস্থায় বসিয়া বসিয়া সুলোচনা অতীতের কত কথা চিন্তা করিতেছিল। আজ সেই দুর্য্যোগা-ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর সান্ধ্য অভিসার নাই। আজ শয়তানের উজ্জ্বল কোজাগরী রজত-শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মঞ্জু-জ্যোৎস্নায় ধবলিত জগৎ-সংসার, সম্মুখে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের অসীমালিঙ্গন-বিস্তার—নীলিমায় চন্দ্রমার পরিপূর্ণ মঞ্জু-শ্রী। আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রশান্ত জলধির গম্ভীর গুরু আস্ফালন—উত্তাল উদ্বেলিত ব্যাদান-ভঙ্গী।······মহা মরণের মহা আহ্বান যেন সুলোচনার অশান্ত হৃদয়কে হস্ত প্রসারিত করিয়া ডাকিতেছিল! অর্ণবের সেই উল্লাসময় মহাগ্রাসে সুলোচনার আজ ত্রাস নাই।

সুলোচনা উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্রের নিদ্রালস দেহটাকে ঘৃণায়

উপেক্ষা করিয়া, অতি সন্তর্পণে, সেই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে সুলোচনা উন্মাদিনীর ন্যায় মুক্তির উল্লাসে ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে সমুদ্র-কিনারে আসিয়া দাঁড়াইল। গদগদকণ্ঠে কহিল—এই দেখ মহান্, তোমার নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতে এসেচি। একদিন ক্ষুদ্র জলাশয়ে আমি ডুবে মর্‌তে পারিনি,—না ম'রে আমার এই শাস্তি—এই অশান্তি! জলপতি, আজ তুমি সম্মুখে—গভীর হ'তে গভীরতর! আজ আমি তোমার নীরব চরণ-তলে স্থির হ'তে পার্‌বো কি? হে অনাদি! বড় শ্রান্ত আমি, বড় দুঃখী আমি—তাই তোমার মত দরদীর কাছে আজ ছুটে এলাম; বল, আমি কেমন করে স্থির হই? এই ত সকলেই স্থির। আকাশ স্থির, চন্দ্রমা স্থির, সুদূরের নক্ষত্র স্থির, নিকটের পৃথিবীও স্থির,—কেবল তুমিই অশান্ত। আমার কি যে জ্বালা, কেবল তোমারি বিদিত,—রাত্র-দিবস তোমারই মত আমার জ্বালার তরঙ্গের আর শেষ নাই। হে অনন্ত, আমাকে সংক্ষেপ করো।

মহেন্দ্রকে মনে পড়িল।

—আবার—আবার তাকে মনে স্থান দিচ্চি কেন? সে ত' আর আমাকে চায় না! আমার সেই তেজটা যে এখন জ্বলে-পুড়ে জুড়িয়ে ছাই হ'য়ে গেছে। সে কোন দিনই আমাকে ত' ভাল বাস্‌তো না—আমার উপেক্ষা, আমার ঘৃণা, আমার তেজটা তা'কে পাগল করে তুলেছিল। আমার আত্ম-রক্ষার শক্তিটুকুই সে আরাধনা কর্‌তো—আর যে-দণ্ডে পোষ মেনে গেলুম—নিজে ভাস্‌লুম—সব ভাসিয়ে দিতে পার্‌লুম—একান্তভাবে তার শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়লুম—এই বন্দিনীকে তখন সে উপেক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—হাতে পেয়ে পায়ে ঠেল্‌লে। হে সর্ব্ব-সন্তাপহারী! হে রত্নাকর! হে বন্ধু! হে দয়াল! আমি সবই ত বিসর্জ্জন দিলুম, এবার আমার নশ্বর দেহটাকেও নাও। এর প্রভাব যে আমার

মনের চেয়েও গুরুতর! এ অনেককে পাগল করেছে, নিজেও পাগল হয়েছে—একটা কুহকী শয়তান যেন এই দেহেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে!

সুলোচনা সেই অসীমকে আলিঙ্গন দিতে স্থল হইতে নামিল। ঊর্দ্ধে শান্ত-শুভ্র স্থির-স্নিগ্ধ শশাঙ্ক—নিম্নে দিগন্তপ্রসারিত তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ উৎকণ্ঠিত আবেদন। সুলোচনা আবার থমকিয়া দাঁড়াইল! সহসা ,অপরাধিনীর ন্যায় নতজানু হইয়া সভয়ে সেই পূর্ণেন্দুর দিকে তাকাইয়া করযোড়ে জানাইতে লাগিল—স্বামিন্! দেবতা! হতভাগিনীকে ক্ষমা করো! ক্ষমা করো!

বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় সম্মুখে একটা পাথরের স্তম্ভের উপর মাথা রাখিয়া স্বামীর চরণ-জ্ঞানে বিহ্বলা সুলোচনা কাঁদিতে লাগিল—অসহনীয় মনস্তাপে তদুপরি মাথা কুটিতে লাগিল।

এদিকে মধ্যরাত্রে, নিদ্রাবিজড়িত চক্ষে মহেন্দ্র পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিল, সুলোচনা নাই! অমনি সচকিতে উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—সুলোচনা, সুলোচনা!

দাসী আদুরীর সজাগ ঘুম, উঠিয়া পড়িয়া হ্যারিকেন হস্তে সেই ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে দাদাবাবু, দরজা খোলা কেন? দিদিমণি কোথায়?

—আমি সেই জন্যেই ত তোকে ডাকলুম।

—আমিও তাই ছুটে এলুম! আজ ক'দিন থেকে মরবে মরবে বলছিল।

—বলিস্ কি? তবে নিশ্চয়ই সে সমুদ্রের দিকে গেছে। পুরীতে এসে অবধি তার কেবল সমুদ্রেরই খোঁজ।

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সমুদ্রের ধারে আসিয়া ডাকিল—

—সুলোচনা! সুলোচনা!

সুলোচনা সে স্বর শুনিতে পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর—"আর আমি শুন্‌চি না, দেখি কেমন ক'রে তুমি আমাকে এইবার ধরো।" বলিতে বলিতে ভীমবেগে সাগরের গভীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সুলোচনা মহেন্দ্রের পুকুরটা এককালে এক ডুবেই পার হইত। যে সাঁতার জানে, তা'র পক্ষে ডুবিয়া মরা সহজ কথা নয়। কারণ, সাঁতারও যে তা'র অনেক স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। অন্ধ না হইলে, স্মৃতির বোঝা নিঃশেষে না নামাইলে মানুষ কি মরিতে পারে? স্মৃতি কেবল জ্বালায়—জ্বালাকে নিঃশেষ করিতে পারে না—কেবল লোক-দেখানো ভস্মে ঢাকিয়া রাখে।

মহেন্দ্রও ঝাঁপাইয়া পড়িল! জীবনে আবার সেই সন্তরণ-প্রতিযোগিতা—সেই পুনরভিনয়। এবার আর ক্ষুদ্র জলাশয়ে নয়—অনন্ত জলধিতে—আজ আর কৈশোরের ক্রীড়া নয়—জীবন-মরণের সংগ্রাম! মরণ যেন মধুর হইয়া আজ চন্দ্র-মল্লিকার ন্যায় ফুটিয়াছে! রজনী-গন্ধার ন্যায় সৌরভের গোপন-অভিসার ভার ছড়াইতেছে। সেই স্মৃতি—সেই সব—সেই প্রসাদপুর—সেই দীর্ঘ অবসর—সেই তীব্র উন্মাদনা! সুলোচনা উন্মাদ, তরঙ্গ উন্মাদ, মহেন্দ্রও উন্মাদ! জীবন-মরণে যেন উন্মাদ-ভঙ্গীতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। তরঙ্গ জানাইতেছে—আমি সুলোচনাকে আমার দেশে লইয়া যাইব। মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিতেছে—আমি কখনই আমার প্রিয়তমাকে যাইতে দিব না।

অদ্ভুত কৌশলে মহেন্দ্র অবিলম্বে সুলোচনাকে ধরিয়া ফেলিল।

—ছাড় বল্‌চি।

—প্রাণ থাক্‌তে নয়।

—কেবল গায়ের জোরে তুমি কখনই আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

—সুলোচনা, তুমি আজ একা মরচো না। তুমি আর একজনকেও জড়িয়ে মরচো।

—কে, তুমি? মর না, এই দণ্ডেই মর না? আমিও বুঝে মরি—তোমার প্রেম একটা ভাণ নয়, একটা রঙ্গালয়ের অভিনয় নয়, একটা জ্বলন্ত—জীবন্ত প্রমাণ।

—সুলোচনা, ভুলে যাচ্ছো কেন—তুমি যে অন্তঃস্বত্ত্বা—গর্ভে তোমার সন্তান—অসহায় এক জীব। একটা ফুটন্ত কোরককে তুমি নিবিয়ে দিতে যাচ্ছ। পাপীর অপরাধে নিরপরাধের দণ্ড বিধাতার ব্যবস্থা নয়।

সুলোচনা এতক্ষণ প্রাণপণেই যুঝিতেছিল—এইবার হাত-পা ছড়াইয়া দিল—মহেন্দ্রের কবলে অবশ হইয়া ঢলিয়া পড়িল……

ঘটনার অপর দিক……

বিমলের জননী মৃত্যু-শয্যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বৃদ্ধা বিরজাকে বলিলেন—দেখিস্ মা, আমার অন্ধের নড়ী বিমল যেন কষ্ট না পায়, যেন ভেবে ভেবে পাগল হ'য়ে না যায়। আমার শিবরাত্রির ওই একটি মাত্র সল্‌তে নাটিও যেন নিব্‌তে না পায়। মা, তুই ছাড়া আর আমাদের আপনার বলতে কে আছে?

বিরজা অশ্রু মুছিয়া বলিল—কি বলে যাচ্চ মা, আমি ত' আর দেখ্‌তে পার্‌বো না, আমায় এবার তোমাদের ছুটী দিতে হবে। একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আমাকে ক্রমাগতই ডাক্‌চে, আমাকে আর স্থির থাক্‌তে দিচ্চে না। এবার আমায় বিদায় দাও মা।

কিন্তু বিমল, মাতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে দেখিয়া বলিল—বোন্, কা'র সঙ্গে কথা কচ্চ, মা যে আর নেই।

বিরজা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল—তাই ত, সত্যই ত’…আমিও জান্‌তে পেরেছিলুম দাদা, মা আর বাঁচ্‌বেন না।

বিমল অধীর হইয়া বলিল—কি হবে বিরজা? এ-বিপদে কে আমাকে সাহায্য করবে? মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তেও যে আমার মাথা হেঁট হয়।

বিরজা কহিল—আমি খবর পাঠিয়েছি দাদা, তাঁরা সব এলেন বলে।

—কিন্তু তুমিও যে যে’তে চাচ্চো, বোন্!

—হ্যাঁ দাদা, আমাকেও এবার যেতে হবে! কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা বন্দোবস্ত ক’রে দিয়ে তবে যাবো।

সুশীল কাঁদ-কাঁদ মুখ করিয়া বলিল—সন্ন্যাসী-মা, তুমি কোথায় যাবে? তুমি গেলে কার কাছে আমি থাক্‌বো?

সংসার-বিরহিণী বিরজার চক্ষে জল আসিল। তাহারও যে এখনও স্বামী-পুত্র বর্ত্তমান। তাহার সব থাকিতেও সে এ জগতে সন্ন্যাসিনী, এ কি কম দুঃখ? বিরজা সে-ব্যথা মুছিয়া ফেলিয়া সুশীলকে বলিল—তুমি ত’ আর এখন ছোটটি নও সুশীল, এইবার তোমার সন্ন্যাসী-মাকে ভোলো—এ-জীবনের মতই ভোলো।

বিমলের মা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বিরজাও সেই ভাঙ্গা সংসারকে জোড়া দিয়া সুশীলকে ধাত্রীরূপে লালন-পালন করিতেছিল। প্রভাতের গোবর-ছড়া হইতে সন্ধ্যার প্রদীপটিতে পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত কাজে বিরজার লক্ষ্য ছিল। বিমলও অভাবের কিছুই টের পায় নাই। বাসন হইতে বিছানা পর্য্যন্ত সবই ঝর্‌-ঝরে তর-তরে। এমন কি, বিমলের ধোপার খরচটি পর্য্যন্ত সে বাঁচাইয়া দিয়াছে।—নিজেই ময়লা কাপড়-চোপড় ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লইয়াছে। কিছুরই যেন নড়-চড় হয় নাই—যেন এ-সংসারে কিছুই ঘটে নাই।

আবার অন্যদিকে বিরজার এক-একটি উপদেশ, দর্শনের এক-একটি জটিল রহস্যে বিমলের মাথা ঘুরিয়া যায়, তাহার ডাক্তারী শিক্ষায় কুলায় না। ক্রমে ক্রমে বিরজার আব্‌হাওয়ায় বিমল বিজ্ঞান ভুলিয়া এক মহা দর্শন-রাজ্যে আসিয়া বিরজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সংসার আর বিমলকে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যথিত করে না—কর্ম্মের চক্র-গতি ক্রমশঃই সে বিরজার তত্ত্বাবধানে নিরূপণ করিতে শিখিয়াছে।

আজ সেই বিরজা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতে চায়।···বিমলদের একটা বিহিত করিয়া তবে বিরজা আপনার পথে আপনি বিদায় লইবে, সেই আশায় বিমলের মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিরজা বাণেশ্বরকে তলব করিয়াছিল।

যথাসময়ে বাণেশ্বর, দীনবন্ধু ও কৈলাস আসিয়া সেই মহা বিপদের সন্ধিক্ষণে হাজির হইলেন। কেবল ভবেশ আসিল না। বিমল ত' দেখিয়াই অবাক্! বিরজা কখন গেল, কিরূপে সে ইহাদের জানাইল, বিমল কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আজ বহুবর্ষ পরে বাণেশ্বর বিরজার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। বিরজাকে গৃহস্থের বৌ-ঝি বলিয়াই সন্ন্যাসী বাণেশ্বরের কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে, কোন সম্ভাষণই তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কৈলাস কিন্তু চিনিতে পারিয়াই সেই চিরমধুর ও সরল আপ্যায়নে জিজ্ঞাসা করিল—

—কি গো, মেয়ে যে! তুমি এখানে?

—আমাকে সবখানেই থাক্‌তে হয়, বুড়ো! ঝোলে অম্বলে কোথাও আর বাদ নাই। কিন্তু তোকে আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, তুই ত' দুনিয়ার খবর রাখিস্। বিজন-গ্রাম কোথায়, বল্‌তে পারিস? তোদের নবদ্বীপ হতে আর কতদূর? সে গ্রামটাকে আমার একবার দেখ্‌তে সাধ হয়েচে। সেখানে আমার শ্বশুর-বাড়ী।

কৈলাস কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল—বিজনগ্রাম ?···হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সে দিনের মুড়োনো-ঝড়ে গ্রামটার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নেই মা! একটা অশথ-গাছের তলায়, একটা পাগলা আর একটা কুঠে কেবল সাক্ষী দিচ্চে। সমস্ত গাঁ'টা ওলাউঠো আর পালা-জ্বরে একটা মস্ত জনশূন্য শ্মশান হয়ে পড়ে আছে।

বিরজা আরও উৎকন্ঠিত হইয়া জানাইল—তবুও আমি যাব, কৈলাস! আমার সর্ব্বস্ব এখনও সেখানে পড়ে রয়েচে। কিন্তু বাণেশ্বর, তুমি যে কথা কইছো না! আমাকে এ-অবস্থায় দেখে খুব অবাক্ হয়ে গিয়েছ—না? কিন্তু উপায় ছিল না। আজ আমি ঠিক সময়েই তোমাকে ডেকেছি। ঠাকুরের সাড়া পেয়ে, আর এখানে বসে থাক্‌বার আমার সময় নেই, এখন আমি ফাঁক যাই। এইবার তুমি একটুখানি জড়াও—এই মাতৃহীনদের এবার তুমি সহায় হও। দেখ, সম্মুখে এঁর মার মৃত্যু! ছেলেটিও অনেকদিন যাবৎ মাতৃহীন! ইনি একজন ডাক্তার। একে জড়ালে, ইনিও তোমাদের জড়িয়ে থাক্‌বেন—তোমাদের একটা মস্ত সহায় বেড়ে যাবে।

বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—বিরজা, তুমি এঁদের কে?

বিরজা উত্তর দিল—আমি এঁদের মা, আমি বোন্, আমি এঁদের বাড়ীর মেয়ে।—এঁদের ভাবনা এখন আমাকেই বেশী ক'রে ভাব্‌তে হয়।

—তবে ছাড়্‌চো কেন?

—কেন ছাড়্‌চি শুন্‌বে বাণেশ্বর? আচ্ছা, বল দেখি, আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়? এই দেখ, আমার সবই বর্ত্তমান। বলিয়া বিরজা তাহার মাথার সিন্দূরে হাত দিল।

বাণেশ্বর সাক্ষ্য দিলেন—দশ বৎসর তোমার পাশে তপস্যায় বসে যা বুঝেচি, তা'তে আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি সহজ নারী নও। তুমি সতী,

তুমি সাধ্বী! সত্যই তুমি বিরজা। গুরুদেব যে সময়ে-সময়ে তোমাকে 'অলকনন্দা' বলে ডাক্‌তেন—তা' মিথ্যে নয়।

বিরজা জানাইল—বাণেশ্বর, আমি শুনেছি আমার হতভাগ্য স্বামী আজ চলচ্ছক্তিহীন, কুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বিজন-গ্রামেই আছেন। তাঁর প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করতে চাই। আমার ঠাকুর যেন আমাকে আজ সেই দিকেই যেতে বল্‌ছেন।

বিমল অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে জানাইল—যে উপকার তুমি করেছ বোন্, তোমার স্বামীর কুষ্ঠের সেবার ভার আমার গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়। তোমার ঋণ একমাত্র তা'তেই যদি কিছু শোধ দিতে পারি।

—না দাদা, আমার পথে আমাকে এক্‌লাই এখন যেতে দাও। মাথার উপর তোমার অনেক কাজ;—সম্মুখেই মাতৃদায়! তোমাকে সাহায্য করতেই তো এঁদের আগমন আজ!

সুলোচনা বাহির হইয়া যাওয়া অবধি গ্রামের লোকের নিকট কোনরূপ সাহায্য চাহিতেও বিমল লজ্জা বোধ করিত, আর সাহায্য করিতে কেহ আসিতও না। তাহার উপর আবার বিরজার এই অহেতুকী আচরণে নানালোকে নানারূপ সন্দেহ করিত। নিতান্ত নিঃসহায় বিমল আজ বিরজার আনুসঙ্গিকদিগকে পাইয়া হৃদয়ে মস্ত বল পাইল। বিমল করযোড়ে বলিল—আজ আপনারাই আমাকে এ আসন্ন দায় হতে মুক্ত করুন। আপনারাই এখন বিপন্নের বন্ধু।

যখন 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনিতে বিমলের মাতৃদেহ দক্ষিণেশ্বরের শ্মশান-ঘাটের দিকে চলিল—তথন বিরজা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে বুকে ধরিয়া নির্জ্জন বাড়ীতে রহিল একা!
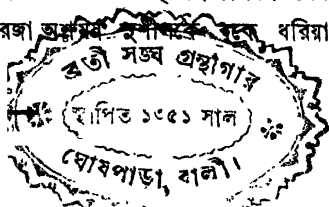
দশম পরিচ্ছেদ

সান্ত্বনার পথে

সুলোচনার গোপন জীবন-সংগ্রাম এত দিনের পর নবদ্বীপের একটা জঙ্গলে প্রকাশ্য সত্যে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সেই সত্যের উপর এখনও মানুষের দৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু প্রভাত-সূর্য্য ত' সেই সদ্য-জাতের মুখের উপর কিরণ-পাত করিতে কৃপণতা করে নাই! বাতাস, আলো, আকাশ ও পৃথিবীর ত অনুগ্রহের অভাব নাই! এমন একটী সদ্য-জীবনকে মহেন্দ্রের পরিচারিকা আদুরী অবিলম্বেই শীতল করিতে চাহে—ঘাতকের কঠিন হস্তে! ইহা অপেক্ষা কঠিনতার দৃষ্টান্ত আর জগতে কি আছে? মাতৃত্ব-নাশের হেন পদ্ধতি নাই, যাহা পাপপথের পথিক পিশাচী আদুরী না জানে।

আজ মহেন্দ্রের মত পাশবাত্মাও এই ভীষণ দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিল! সুলোচনা যখন পুরীর সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতেছিল, 'পাপীর অপরাধে নিরপরাধের দণ্ড বিধাতার ব্যবস্থা নয়'—এই ঈশ্বর-ভয় দেখাইয়া মহেন্দ্র সুলোচনাকে সে ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে ফিরাইয়াছিল। কিন্তু আজ?

সুলোচনা ধাপে ধাপে অনেক নামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়কে সে দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা বহিয়াও যে ছাড়িতে পারে নাই!

আদুরী বলিল,—দিদিমণি, দাও গো, অত মায়া বাড়াও কেন? ভোর থাক্‌তে থাক্‌তে, সূয্যি না উঠ্‌তে উঠ্‌তে তোমার কলঙ্কের বোঝা নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দি'। এটা মেয়ে হ'লে না হয় আমি পুষ্‌তুম, কিন্তু এটা যে ছেলে হয়ে জন্মেছে!—

ক্লান্তমান কণ্ঠে সুলোচনা বলিল—আমার পাপে এর সর্ব্বনাশ করিস্‌নি।

আমাকে বরঞ্চ কিছু খাইয়ে মেরে ফেল্। নারী হয়ে নারীকে উদ্ধার করলে তোর পুণ্যি হবে, তুই আস্‌চে জন্মে সতী হয়ে জন্মাবি।

—বেশ আশীর্ব্বাদ! এই ত কলির সন্ধ্যে, তোমাকে এরই মধ্যে মেরে ফেলবো? এখনো কত তীর্থ পড়ে রয়েচে।···দাও, এটাকে ত' আগে সাঙ্গ করি। বলিয়া আতুরী সদ্যজাত শিশুকে ধরিতে গেল।

পাষাণবৎ মহেন্দ্র,—সেই কঠিন দৃশ্যে একপদ-দুইপদ করিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিল।

সুলোচনা তীব্র-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—কাপুরুষ, প্রবঞ্চক, পালাচ্চো যে? চিরদিনের মত মজিয়ে, শেষটা পথে বসিয়ে তোমার এই কাজ?

আতুরী টিপ্পনি দিয়া বলিল—দাদাবাবুর কি আর সে রুচি আছে দিদিমণি? এখন আমি যে সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী—এ-পথের মজাই তো এই!

কথাটা রূঢ় সত্য হইলেও, সুলোচনার প্রাণে বাজিল।

—আমিও সেই সামগ্রী? মহেন্দ্র, তুমিও আজ বধির যে!—এই না তোমার জন্ম-জন্মান্তরের অপরিমেয় প্রেম?···কাঁপছো?...যে রূপে তুমি মুগ্ধ হতে, সেই আমি,—এখন আমাকে দেখে তুমি কাঁপ্‌চো? তোমার একটা নগণ্য ঝি আমাকে মুখের উপর এমন কথা শুনিয়ে দিতে পারলে—আর তুমি নীরব?

মহেন্দ্র যেমন আজ পশ্চাৎপদ, আতুরী তেমনি অগ্রসর। সুলোচনা ব্যাপার দেখিয়া প্রমাদ গণিল। শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছাড় বল্‌ছি। আমি কাকেও চাই না। আমি পথে পথে ভিক্ষা করে খাবো।

এমন সময়ে কোথা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুর প্রভাত-সূর্য্যের তরুণ

আলোয় স্নান করিয়া, প্রাতঃসমীরণের মধ্যে অপার্থিব তন্ময়তা জাগাইয়া সুলোচনার তাপদগ্ধ শ্রবণে প্রবেশ করিল।

...গান থামাইয়া বিরজা সুপরিচিতার ন্যায় সুলোচনার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বোন, জলদ জল দিলে ?

সুলোচনা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি ? প্রসাদপুরের সেই ভিখারিণী নয় ?···আমার জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড় যে বয়ে গেল! সেই তো এলে—কিন্তু বড় অসময়ে—

—আমি ঠিকই এসেচি, আমার ত' আর তোমার মত একটা দিক নয়। তোমার ছেঁড়া ঘরখানি আমি তালি দিয়ে রেখেছিলুম—তাই ত বিলম্ব এত।···আমাকে মনে পড়চে ?

—তোমাকে না মনে পড়লেও তোমার গানটি আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে আছে। তুমি পদে পদে সাবধান করে দিয়েছিলে, আমিও অনেক চেষ্টা করেছিলুম সাবধান হ'তে। কিন্তু শুক্‌নো পথেও যে আমাকে আছাড় খেতে হলো! পিছ্‌লে আজ কোথায় পড়ে গেছি দেখ!

আহা, অনেক জ্বলেছ—সোণার অঙ্গ কালি করে ফেলেছ। কি ছিলে, কি হয়েছ, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মরতে পারোনি ?

—মরতেও কম চেষ্টা করিনি দিদি। কিন্তু যে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, সে সর্ব্বজ্বালা-বিনাশিনী গঙ্গায় ডুবে মরবে কেন ? আমি এতই পাপিনী যে, সেদিন যমও আমাকে নিতে চাইলে না।

—এখন কি করবে ভাবচো ?

—সব ছেড়ে তোমার সঙ্গ নেব ভাবচি।

—আর একটু বিলম্ব কর, আমার একটা কাজ আছে, সেরে নিই।

—এ যে অনন্ত পথ দিদি, পথ যে জানিনি!

—এইবার জান্‌বে—পথের সন্ধান পথই তোমাকে বলে দেবে। পথ

চিন্‌লেই পথের সাথী আমি হব। কিন্তু—ওই দেখ, তোমার সাথের সাথী তোমাকে ছেড়ে ঐ পালিয়ে যাচ্চে! কিন্তু আর ওদিকে তাকিও না, আরও ঠকবে!

মহেন্দ্র পলাইল। চোরের মত নীরবে, নিঃশব্দে কোথায় উধাও হইয়া গেল। সুলোচনাকে একটি কথাও বলিয়া গেল না। তাহার মূল্যবান্ সাজ-পোষাক, বিপুল দ্রব্যসম্ভার—টাকাকড়ি—কিছুর দিকে সে লক্ষ্য করিল না,—সব ছাড়িয়া ভীত মহেন্দ্র কেবলমাত্র মূক অভিনয় করিয়া পাপের পরিণাম-পুষ্ট আতঙ্কে সটান চলিয়া গেল—ফিরিয়াও তাকাইল না।

পথিক চলিল বটে, কিন্তু পায়ের কাঁটা আদুরী কাছে-কাছেই বিরজাকে আড়াল করিয়া মহেন্দ্রের পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলির লোভে গৃধিনীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

সুলোচনা সকাতরে জানাইল—কিন্তু এটাকে নিয়ে কি করবো, দিদি?

—এস, তার উপায় আমি করে দিচ্চি, ভয় নেই—তোমার কলঙ্ক আমিই বইব।

পথের বিরজা, সুলোচনাকে পথে লইয়া চলিল—সেই পথে আদুরীও পায়ের কাঁটার মতই বিঁধিয়া রহিল।

মহেন্দ্র যাহা করে, অন্ধ প্রকৃতির বশে করে, শৃঙ্খলা বা নীতির মুখ চাহে না, অনুশাসনের কোন বাধাই মানে না। যে সুলোচনার আকর্ষণের নেশায় মহেন্দ্র এতকাল জীবনটাকে যন্ত্রণার নিষ্পেষণ-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সুলোচনার নামটি পর্য্যন্ত আজ আর তাহার মনে নাই। মহেন্দ্র সর্ব্ববিষয়েই চরমপন্থী!

কিন্তু এইবার তাহার অন্তরে আসিয়াছে অনুতাপের তীব্র দহন-জ্বালা। সেই জ্বালায় জ্বলিতে-জ্বলিতে অনুতপ্ত মহেন্দ্র সেই যে হাঁটা-পথে নবদ্বীপ হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, নদ, নদী, বন, পাহাড় ভেদ করিয়া কোন্ অ-পাওয়ার সন্ধানে নিশি-দিন সে নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়াছে! মহেন্দ্রের কিছুতে কর্ণপাত নাই, কোন বস্তুতে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবলি অন্যমনা উদ্-ভ্রান্ত-গতি—কেবলি উন্মাদের অন্বেষণ! যেন হাত পাতিয়া পাগল চলিয়াছে—কি পাইতে হইবে তাহা জানে না! সুলোচনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া—তাহাতে হতাশ হইয়া—আবার এ কিসের পশ্চাৎ-ধাবন!

পরিণাম-ভীত পলাতক মহেন্দ্র চলিতে চলিতে অকস্মাৎ শুনিল,—তিষ্ঠ! এ গভীর বনে, এমন ভয়ঙ্কর কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় কে তুমি?

কথা শেষ হইবামাত্রই মহেন্দ্রের গতি-সম্মুখে দপ্ করিয়া ধুনী জ্বলিয়া উঠিল। মহেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, সত্যই এক ভীষণকায় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি জটাজুটধারী মহাপুরুষ শার্দ্দূল-চর্ম্মে বসিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার সম্মুখেই নরখর্পর-মণ্ডিত ত্রিশূল! মহেন্দ্রের শরীরে রোমাঞ্চ ও মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল—মানুষকে দেখিয়া আজ মানুষের প্রাণ উড়িয়া গেল!

প্রশ্ন হইল—কে তুমি?

উত্তর হইল—আমি মহাপাপী।

প্রশ্ন হইল—কোথায় যাচ্চ?

উত্তর হইল—পাপের প্রায়শ্চিত্তের অন্বেষণে—অজানা রাজ্যে।

অপেক্ষাকৃত নরম সুরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—কিছু খেয়েছ কি?

মহেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিল—খাওয়া। সে আবার কি?

—খাওয়াও ভুলে গেছিস্‌রে, পাগল! এই নে, মা'র স্তনের কিঞ্চিৎ আনন্দ! এই আনন্দে আবার ভুমিষ্ঠ হ'!—বলিয়া তান্ত্রিক অবধূত মাধবাচার্য্য মড়ার খুলি করিয়া মহেন্দ্রকে কি-যেন বাড়াইয়া দিলেন।

সুলোচনার সুকোমল অধর-পিয়াসী মহেন্দ্র আজ অবাধে মড়ার খুলি মুখে তুলিল!

মহেন্দ্র অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া এইবার জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু এই ভীষণ অরণ্যে কেমন করে আপনার চলে?

মাধবাচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন—এত পথ চলে এসেও আবার সেই চলার কথা? আবার দোকানদারীর লেন-দেন এনে ফেল্‌লি?...কি আক্ষেপ! আরে মুর্খ, মা'র রাজ্যে আবার অভাব? কেমন ক'রে চলে— দেখবি?

এমনি সময় এক আহীর-দম্পতী সেই বিজন-বন্ধুর পথ দিয়া তাহাদের গোধন লইয়া ফিরিতেছিল—গোধনগুলির গলায় শ্রুতিমধুর ঘণ্টা বাজিতেছিল। প্রত্যহ বেলাবসানে ইহারা তাহাদিগের সন্ন্যাসী-বাবাকে এক লোটা দুধ দিতে আসে, আর বিনিময়ে সন্ন্যাসীর বেদীর সম্মুখ হইতে মুঠা মুঠা পয়সা ও আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া লইয়া যায়—বনের অযত্ন-সুলভ ফুল-ফল কুড়াইবার মত! যাত্রীরা কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়া, সাধু-দর্শনে আসিয়া যাহা কিছু দিয়া যায়, সবই মাধবাচার্য্যের এই পাহাড়ী বাপ-মার একচেটিয়া প্রাপ্য। মাধবাচার্য্য কেবল অপোগণ্ড শিশুর মত এই অপূর্ব্ব বাপ-মায়ের দুধের উপর জীবন ধারণ করেন। 'গোড় লাগি মহারাজ' বলিয়া আহীর-দম্পতী

সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুতে দুধ ঢালিয়া দিয়া বিক্ষিপ্ত পয়সাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

মাধবাচার্য্য মহেন্দ্রকে বলিলেন—দেখ্‌লি এই বনেও আমার কেমন করে চলে? এই বনের অন্ধকারেও আমার কেমন অপূর্ব্ব সংসার?

মহেন্দ্র অবনত হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল—ঠাকুর, এই মহাপাপীর সকল ভার আজ হতে আপনি গ্রহণ করুন—আমি যে নিরীহ কুলাঙ্গনার সর্ব্বনাশ করে এসেছি—অকপট বন্ধুর উপরেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছি—নিরীহ শিশুর হত্যাপরাধের কারণ হয়েছি!—আমার ইহ-পরকালে গতি-মুক্তি নাই!

মাধবাচার্য্য সেই প্রপন্নকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—সত্যই তুমি অসাধ্য রোগী! এস, আজ থেকে তোমার চিকিৎসার ভার আমিই গ্রহণ করি। দুর্ব্বল! আমার চক্ষে তুমি কোন কালেই পাপী নও। একটা দুঃসাধ্য-ব্যাধিক্লিষ্ট—দেহ ও মনের স্বাস্থ্যচ্যুত রোগী!—এস, তোমার রোগ-প্রতিকারের বন্দোবস্ত করি।

তান্ত্রিক মাধবাচার্য্য মহাপাপী মহেন্দ্রকে আজ চরণপ্রান্তে স্থান দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরিত্যক্ত

ভবিষ্যতের দরজা সাধারণ মানুষ খোলা দেখিতে পায় না। তাই মানুষের দশ-দশা; তাই সে অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া রক্তের তেজে যাহা-তাহা করিয়া যায়।

বিরজার স্বামী নূতন গিন্নীর প্ররোচনায় বিনা অপরাধেই উত্তরা খণ্ডের কোন মেলায় বিরজাকে ফেলিয়া যায়, অতঃপর বিরজার গুরুদেব সেই বিবর্জ্জিতা নারীকে অনন্যোপায় হইয়া নিজের শিষ্যা করেন। রুগ্ন পুত্র ভবেশকেও অকারণ বাটী হইতে দূর করিয়া দেয়। যাহাদিগের তৃপ্তির জন্য সে এই অন্যায় কাজ করিয়াছিল, তাহারাই আজ তাহাকে পথে বসাইয়াছে। আজ বিরজার স্বামীর দুইটা চক্ষুই অন্ধ—গলিত কুষ্ঠে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন! গ্রামের পাগল হরে-পাটুনী ও একটা কাল কুকুর ছাড়া সেই হতভাগার আর বিপদের বন্ধু তৃতীয় ছিল না। নদী-তীরে শ্মশানভূমে একটি অশ্বত্থগাছের তলায় আজ সেই আতুরের আস্তানা—গ্রামের পরিত্যক্ত হাঁড়ি-কলসীও সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে। একটা কাঠের বাক্সের অপরিসর গাড়ীতে সেই আতুর উপবিষ্ট—চারিদিকে কতকগুলা নিঃশেষিত ডাব ও মালসা গড়াগড়ি যাইতেছে, চাল-চুলা কিছুই নাই। কুকুরটা শবের মতই সেই জীবিতের গাত্র লেহন করিয়া ক্ষত পরিষ্কার রাখিতেছে ও মাছি তাড়াইতেছে। কি বীভৎস নিঃসহায় অবস্থা! হরে-পাগলা উচ্ছিষ্ট আনিয়া নিজে খায় ও তাহার আশ্রিতকে খাওয়ায়! কেহ জল খাইয়া ডাব ফেলিয়া দিল, হরে-পাগ্‌লা শাঁসটুকু আনিয়া নিজে না খাইয়া বিরজার স্বামীকে খাওয়ায় ও ভগবানের দয়ার মহিমা জ্ঞাপন করে।

প্রভুভক্ত, আশ্রিতরক্ষক কুকুরটিও কম দয়ার আধার নহে। পাগলা যখন আহার্য্য অন্বেষণে বহির্গত হয়, কুকুর বাহির হইতে মড়ার হাড় আনিয়া ফেলে—সে হয়ত ভাবে, তাহাও মানুষের খাদ্য, লইয়া যাই, যদি প্রভু খায়!

পাগ্‌লার সহানুভূতি-বোধ আছে, কিন্তু শৃঙ্খলা-জ্ঞান নাই। কুকুরটির প্রভুভক্তি আছে, কিন্তু খাদ্যের বিচার নাই—কোন দ্রব্যেই ঘৃণা-বোধ নাই। পাগ্‌লারও ঘৃণা-বোধ নাই। ঘৃণা-বোধ থাকিলে, সেই নিতান্ত নিরাশ্রয়-জন আজ কাহার কাছে থাকিত?

হরে-পাটুনী প্রবল বন্যায় বর্ষাকালে যাত্রীদের ডোঙ্গায় করিয়া নদী পার করে ও একটি করিয়া পয়সা পায়। আজও বর্ষায় নদী বাড়িয়াছে—ওপারে একটি যাত্রী দাঁড়াইয়া। হরে-পাটুনী যাত্রীর দিকে তাকাইয়া আছে, আবার অবসর পাইলে তামাক সাজিয়া সেই নিরাশ্রয়ের মুখে কলিকা ধরিতেছে। কারণ, তাহার হাত দুইটা কুষ্ঠ-রোগে একেবারে বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে—খাওয়াইয়া না দিলে বিরজার স্বামীর আর অন্য উপায় নাই।

বিরজার স্বামী জানাইল—ছাখ্‌না বাবা, হ'রে, কিছু খাবার যোগাড়। এখনও বসে বসে তুই তামাক ফুঁক্‌বি? কাল থেকে কিছুই যে খাওয়া হয়নি! কাল সারা দিনটা পাগ্‌লামী করে বেড়ালি—খিদে পেলে কি পাগ্‌লামী থাকে রে?

—যাই বাবা, ওই একটা যাত্রী দাঁড়িয়ে, দেখি কি পাওয়া যায়। কিছু পেলে, গরম মুড়ি এনে খাওয়াব।

পাগ্‌লা ডোঙ্গা লইয়া ও-পারে চলিল। জল আজ এতই বাড়িয়াছে যে, আর কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অশ্বথ গাছের সমীপবর্ত্তী না হয়! হরে-পাটুনী চিরকাল পাগল ছিল না—গভীর পুত্র-শোকের আঘাতে সে পাগল

স্বামিতীর্থ—
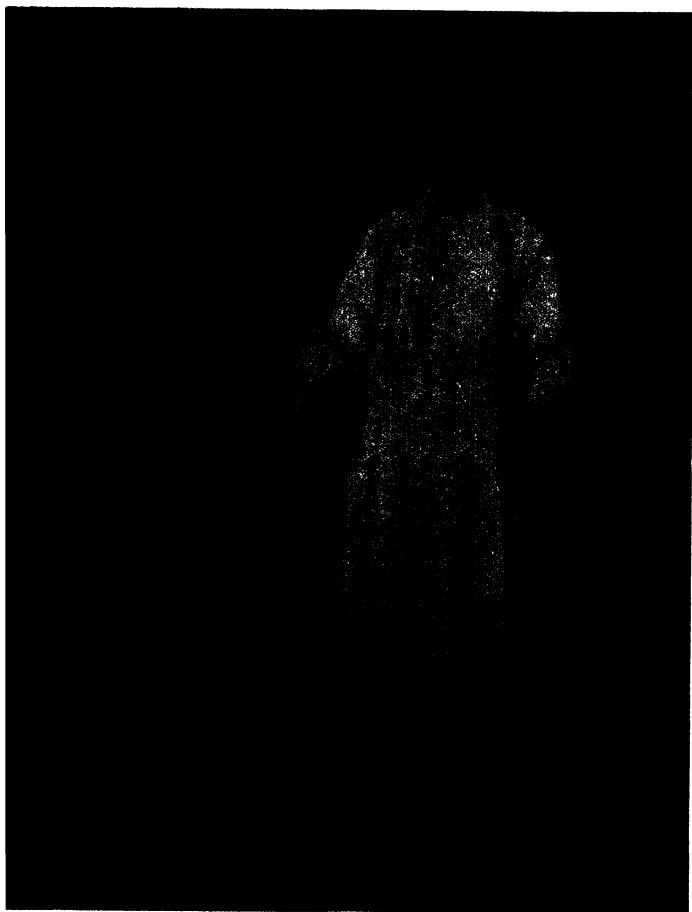
সুষমা ও মহেন্দ্র
সুষমা স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছে।

হইয়া আবার হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে! পাগলের যত কিছু পুত্র-স্নেহ, সেই নিরাশ্রিতের প্রতি পড়িয়াছে—তাহারই সেবা এবং যত্নই আজ তাহার ছেলে-খোঁজা জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা!

পারের যাত্রী আর কেহই নহে, আমাদের বিরজা। কত অন্বেষণের পর আবার তাহার শ্বশুর-বাড়ীর দেশে পদার্পণ করিতেছে—পতির পাদপদ্ম দর্শন ও পুত্রের মুখচুম্বন করিবার আশায়! বিরজা হরে-পাটুনীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল—কি হরি, মনে পড়ে? আজও তুই পার কর্‌চিস্—

—কে, বড়-মা? এত দিন কোথায় ছিলে মা? বাবার দশা শুনেছ ত?

—বেঁচে আছে ত?

—হ্যাঁ বেঁচে আছে, কিন্তু মরারই তুল্য!

—ভবেশ?

—কে, ভবু-দাদা! তার খোঁজ-খবর অনেক কালই নেই মা? বাবার রাগ ত' জান? রাগই ত' তার যত রোগের মূল, বড়-মা। সব বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেও বিসর্জ্জন যেতে বসেছে! ভাগ্যিস্ তোমার এই হরে ছিল, তাই এ যাত্রা উনি কোন রকমে টিঁকে গেলেন। তা না হ'লে বনের শিয়াল কুকুর পর্য্যন্ত কেঁদে যেতো—যেমন করে গাঁয়ের কেলো কাঁদ্‌চে!

—কেলো কে-রে?

—দেখ্‌বে চলো বড়-মা, বাবার কি দুর্দ্দশা!

বর্ষার জলে আজ চারি দিক্ থৈ-থৈ করিতেছে। দূরে অতি দূরে দুই একটা জেলে-মালার কুটীর—হোগ্‌লা-বনের মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছে। বিজনগ্রাম সত্য সত্যই যেন বিজনগ্রাম! ধানের ক্ষেত আজ বর্ষার সমুদ্রের মতই দেখাইতেছে। হরে আজ মনের উল্লাসে সেই ক্ষুদ্র

ডিঙ্গি করিয়া তাহার বহুকালের বড়-মা'কে পার করিল—বড়-মা'কে পাইয়া সে যে কি উল্লাস, তা চোখে না দেখিলে কথায় বুঝানো যায় না।

তীরে না নামিতেই কুকুরটা দৌড়াইয়া আসিল। হরে পরিচয় করাইতে বলিল—এই আমাদের কেলো, মা। এও তোমার একটা পেটের ছেলের কাজ করচে। বাবাকে দাঁতে করে ডাব এনে খাওয়ায়!

—হা অদৃষ্ট, এত দুঃখও দেখ্‌তে হ'ল!—বলিয়া বিরজা চক্ষু মুছিল।

—বাবা, আজ কে এসেচে দেখ্‌চো? তোমার সুমুখে বড়-মা—

বিরজা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ?

—কে, বিরজা! আর চোখে দেখ্‌তে পাইনি বিরজা। তোমার শাপ আমার হাড়ে হাড়ে লেগেচে!

—কই, শাপ ত তোমাকে কখনও ভুলেও দিইনি! অনেক অত্যাচার করেচ, সবই নীরবে সয়েচি, কিন্তু মুখ-ফুটে কখনও শাপ ত দিইনি!

—চোখের জল ফেলেছিলে ত?

—হ্যাঁ, তোমার জন্যে আজও তা ফেল্‌ছি। কি ছিলে আর কি হয়ে গেলে!

সেই চোখের জলই ত' আমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে বেরিয়েচে! তোকে ধরে মার্‌তুম, কল্‌কে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতুম, হয় ত সে-দাগ এখনও আছে—তার শাস্তি এই দ্যাখ্‌ বিরজা!—বলিয়া লুকানো গলিত হাত দুখানি উপরে তুলিয়া দেখাইল। কী সে বীভৎস দৃশ্য!

—আর দেখিও না, থাক্‌, আর আমায় কাঁদিয়ো না। তোমার আজ এত দুর্দ্দশা! তাই যেন আমার গুরুদেব আমাকে এ পথেই শেষটা টেনে আন্‌লেন!—বিরজা স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিল ও কিছুক্ষণ নীরবে নয়নজল ফেলিতে লাগিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা, সে-সব বাড়ী-ঘর-দোর?

—সব চুলোয় গেছে! সোনার অট্টালিকাতে বসিয়ে গেলেও রাখাল-কিষণের হাত ধর্‌তেই হয়েচে বড়-গিন্নি!···তোমার সতীনের উপর সেই বাক্যই ফলেচে।

—আর ভবেশ?

—তাকেও তোমারি মত বিদায় করেছি গিন্নি, তার কোন খবরই আর পাই না!—মতিচ্ছন্ন দশা ধর্‌লে মানুষ যা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আমার আজ তাই ঘটেচে! অতঃপর হরেকে বলিল—ওরে পাগ্‌লা, একটু তামাক সাজ্‌তো!

—কিছু খেয়েছ কি, না খালি গাজা আর তামাক খেয়েই চ'লছে? এস, যা এনেচি, আমি খাইয়ে দিচ্ছি!—বলিয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া স্বহস্তে বিরজা স্বামীকে খাওয়াইতে বসিল।

—কাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি বিরজা, বৃষ্টিতে চাল-চুলো সবই গলে পড়্‌চে।

—এই নে হরে, তুইও দুটো খা'—বলিয়া বিরজা হরের হাতে কতকগুলা মোণ্ডা দিল এবং কেলোকুকুরকেও কয়েকটা দিল।

খাওয়া শেষ করিয়া হরে জানাইল—বাবা, মা ত তোমার জ্বালায় সন্ন্যাসিনী হয়েচেন, এইবার তুমিও সাধু হও! আর তোমার কাছে বসে বসে চিরদিনটা এত গাঁজা টিপ্লুম, কিন্তু সাধু আর হতে পাল্লুম কই—দেখি, এবার মা-ঠাক্‌রুণ যদি কৃপা করেন!

বিরজা দুর্দ্দশার কূল-কিনারা না পাইয়া শেষের কয়টা দিন সেই গাছতলাতেই স্বামী-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শূন্য-মন্দির

ভবেশ প্রায়ই নবদ্বীপের আশ্রম পরিদর্শনে যাইত। কিন্তু এই ঘন-ঘন পরিদর্শনই ভবেশের মনের সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। নির্যাতিতা সুষমার প্রতি তাহার মনের সেই প্রথম দিনের নির্দোষ সহানুভূতিটুকু—ক্রমশঃ অন্য আকার ধারণ করিতেছিল।

আজকাল তাহার মনের অবস্থা—সুষমাকে তাহার ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সুষমা যেন তাহাকে প্রকাশ্যে দেখিয়া না ফেলে! এ যেন প্রেমের স্বপ্ন-রাজ্যে প্রণয়ীর সতর্ক অভিসার!

ভবেশ প্রতিবারেই ব্যর্থ নিরাশা লইয়া ফেরে—সুষমার সঙ্গে কেবল কাজের কথা ছাড়া, অন্য কথা পাড়িবার উপায় পায় না। ব্যর্থ নিরাশা লইয়া ফিরিতে ফিরিতে একদিন একটি দেবদারু-বৃক্ষের গায়ে পেন্সিল কাটিবার ছুরিতে "হতাশ" ক্ষোদিত করিয়া ভবেশ তাহারই তলে বসিয়া পড়িল। সম্মুখেই একটি ভগ্ন দেব-মন্দির তাহার উদাস দৃষ্টিপথকে আকর্ষিত করিতেছিল, অপার শূন্যতার দিকে চাহিতে চাহিতে ভবেশ নিজ মনে গাহিতে লাগিল—

"দেখার নাহি তো শেষ, সুরে শুধু ধরা দাও,
রূপের এ-পার হতে যত ছবি হ'রে নাও!
তোমার পায়ের ধ্বনি, মম প্রাণে রেখে যাও,
রূপের ওপারে বসি, আমি শুনি—তুমি গাও—"

তখনো গান শেষ হয় নাই—আশ্রমের ভিতর হইতে মঞ্জুশ্রী, সুষমা ও একটি শিশুপুত্র বাহির হইয়া পড়িল। আশ্রম-কন্যা মঞ্জুশ্রীর রূপলাবণ্যে

যেন চারিদিক্ ফাটিয়া পড়িতেছিল—অথচ অমন কন্যা আশ্রম-পালিতা বলিয়া কোন বিবাহপ্রার্থী জুটিতেছিল না। মঞ্জুশ্রীকে আর রাখা যায় না—বাণেশ্বর এই আশ্রম-দুহিতার বিবাহের কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই।

সুষমা জিজ্ঞাসা করিল—ভবেশবাবু, আপনার গানটি এখুনি বাঁধ্‌লেন না কি? মঞ্জু শুনে গানটি লিখে নিতে চাইছিল—এখান থেকে যাবার আগে গানটি আর একবার সকলকে শোনাবেন, মঞ্জু—টুকে রাখ্‌বে। আপনার গানগুলো সকলকেই কেমন আকৃষ্ট করে—

—কেবল আপনি ছাড়া বোধ হয়। ছেলে-মেয়েদের যে ভাবে আপনি অঙ্ক কষাতে ব্যস্ত থাকেন, তা দেখে আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি না যে, গান আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারে।

—শুধু তৃপ্তিই দেয় না ভবেশবাবু, আমি সেগুলিকে গাই এবং মেয়েদের গাওয়াই। আপনি যদি স্বকর্ণে শুন্‌তে চান, আপনাকে আমরা শোনাতে পারি। অতঃপর মঞ্জুকে বলিল—মঞ্জু, সেই গানটি ওঁকে শুনিয়ে দে ত রে?

লজ্জায় মঞ্জুর সুন্দর মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মঞ্জু শুনিয়াছিল, তাহাদের আশ্রম-পিতা তাহাকে ভবেশের হস্তেই সমর্পণ করিবার আয়োজন করিতেছেন।

—মঞ্জু আপনাকে শুনিয়ে দেবে ভবেশবাবু—কিন্তু এই কড়ারে যে, আপনি মঞ্জুকে বিয়ে করবেন!

শুনাইয়া দিবার যাহাও বা আশা ছিল, সুষমার এই কথায় আর তাহার এতটুকু রহিল না। মঞ্জুশ্রী আর নত মুখ উর্দ্ধে তুলিতে পারিল না। অতঃপর আর একটি অল্প-বয়স্কা আশ্রম-কন্যা তাহাদের শিক্ষয়িত্রীর কাছে উপস্থিত হইল!

সুষমা ছাত্রীটিকে আদেশ করিল—ভবেশবাবুর সেই গানটা গা'ত অর্চ্চনা !

—কোন্ গানটা দিদিমণি ?

—সেই যে রে, যে-গানটার 'শিল্পী' নাম দেওয়া হয়েছিল—

অর্চ্চনা গাহিল—

"আঘাত তোমার ফুলের বুকে
বড়ই সুমধুর !
তৃণের বুকে সারা রাতি
নয়ন-জলের সুর—"

সুষমা বলিল—আপনার এই গানটা যেন জীবন থেকে একটা ভার নামিয়ে দেয়, ভবেশ বাবু।

ভবেশ জানাইল—আমি ভাবি, আপনি অঙ্ক কষাতেই মত্ত থাকেন, কবি-কল্পনা আপনাকে মোহিত করতে পারে না।

সুষমা ব্যথা পাইয়া বলিল—সারা জীবনটা যার চোখের জলে ভরপুর, তার মন কি এতটাই ছোট ভাবেন, ভবেশবাবু ? কেন, আমার সেই বিষাদ-পুষ্ট দুঃখের রাত্রির কথা কি আপনি বিস্মৃত ? দুঃখই যে অতি-বড় নিশ্চিন্তকেও মহাভাবুক করে তোলে।

ভবেশ সবিস্ময়ে বলিল—তবে আপনিও ভাবেন ? আমার ধারণা ছিল—পৃথিবীর কর্ত্তব্য নিয়েই আপনি ব্যস্ত রয়েছেন।

সুষমা উত্তর দিল—কর্ত্তব্য নিয়ে থাকি—জীবনের আকাঙ্ক্ষা গুলোকে ছাই করে ফেল্‌বার জন্যে! আপনার মত কল্পনা-রাজ্যের স্বপ্ন-চয়ন আমার মত নির্যাতিতার পক্ষে শুভজনক নয়। আকাঙ্ক্ষা হ'তে নিবৃত্তিই এখন আমার ধর্ম্ম।

—আমার পক্ষে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ অসম্ভব !

—তবে আপনি দুর্ব্বলচিত্ত। ভাবুক হয়েও ভাবের উপর আপনার অধিকার-শক্তি নেই! মনকে বাঁধ্‌বার কঠিন তপস্যা নেই!

—এই মনই ত একদিন বারাণসী-বক্ষে সকল কবি-কল্পনা নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়ে গুরুর অনুগামী হ'তে পেরেছিল। কী সে তীব্র বৈরাগ্য! সে কথা ভাব্‌লে, এখন বাস্তবিকই আমাকে লজ্জিত হতে হয়।

সুষমা বুঝাইয়া দিল—সে বৈরাগ্য চিরন্তনের নয়, একটা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আপনি আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু আমি নারী—আমার তপস্যা কেবল ক্ষণিকের নয়—আবার সামান্য ত্রুটিতে একটা জাতিকে জবাব দিতে হয়, ভবেশবাবু!...নারী আর পুরুষে এইখানেই প্রভেদ। আপনাদের যা-কিছু সবই আকস্মিক। আমাদের চরিত্রে চিরন্তনের প্রভাব না থাক্‌লে, সৃষ্টি আজ রসাতলে যেত।

ভবেশ মনে পড়াইয়া দিল—শুনেছি, আপনার স্বামী অত্যাচারী ও লম্পট। সেই চরিত্রহীনের উপরে কি করে যে আপনার এখনও অগাধ ভক্তি আস্‌তে পারে, তা আমি মনস্তত্ত্বের দিক্‌ দিয়ে ভেবেই পাই না। ভক্তি বলুন, ভালবাসা বলুন, সবই সমানে-সমানে।

সুষমা উত্তর দিল—সবই কি সমানে-সমানে হয়, ভবেশবাবু? সংসার সাধারণের। মুষ্টিমেয় অসাধারণ ব্যক্তিদিগের জন্য নয়। অ-সমানকে সমান করে নিতে হয়। আমার এই দুঃখ যে, এজন্মে আমার সেবায়, আমার পুণ্যে, আমার দৃঢ়তায়—আমার মাধুর্য্যে—আমার অশ্রুজলে আমি তাঁকে ফেরাতে পারি নি। হয়ত সে অবসর তিনি নিজেও আমাকে দেন নি। তিনি যে কি, তা কেবল একটি দিন মাত্র জীবনে অনুভব করতে পেয়েছিলাম—

সুষমার সেই হাসপাতালের দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল! কিছুক্ষণের

জন্য নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—ভবেশবাবু, আমি ভাবি, আমার স্বামী কখনই পাপী ন'ন, তিনি একটা অসাধ্য রোগী, একেবারেই স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা, কপটতা আমার একটা দুর্জ্জয় রোগ বলেই মনে হয়। কোন ওষুধ খেলে হয়ত তিনি সারতেও পারতেন।...আমি এই মাত্র জানি, তিনি আমার রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল স্বামী, আমি তাঁর অযোগ্যা সেবিকা।

টস্ টস্ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় সুষমার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

সহসা ভবেশ নতজানু হইয়া বলিল—দেবি! আমাকে মার্জ্জনা করুন! আমি আপনার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝতে না পেরে যে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিলুম, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করুন! আপনার স্বামী অপেক্ষা আমার রোগ আরও যে অসাধ্য! প্রায়শ্চিত্ত—তুষানল, চিকিৎসা—বিষ!—বলিতে বলিতে ভবেশ আর ক্ষণমাত্রও সেখানে রহিল না—একটা মহা-ঔদাস্যের রাজ্যে নাস্তিকের ন্যায় ছুটিয়া চলিল!

মঞ্জুশ্রী অঙ্গুলি দ্বারা সুষমাকে দেখাইল—দেখ দিদি, ভবেশবাবুর কেমন কীর্ত্তি!

সুষমা দেখিল—বড় বড় অক্ষরে দেবদারু-বৃক্ষের গায়ে ক্ষোদিত রহিয়াছে—"হতাশ!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বহুবর্ষ পরে

বহুবর্ষ পরে সুলোচনা ফিরিয়াছে—তাহার উজ্জ্বল জীবনের রঙ্গভূমি দক্ষিণেশ্বরে! সুলোচনা যে-সব দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিল, আজ কিছুই তাহার নাই। সেই খেজুর গাছ, সেই বাঁশ ঝাড়, সেই কলিকা-ফুলের গাছ, সেই মধুমালতীর ঝোপ, সেই ভেঙ্গে-পড়া একতলা, সেই কচু-বন-ঘেরা পুকুর—সেই সব পূর্ব্বস্মৃতির কোন চিহ্নই আর বর্ত্তমান নাই। আজ সুলোচনার অতীতের রঙ্গভূমিতে এক নূতন ধরণের চকমিলানো গেটওয়ালা দ্বিতল ভবন উঠিয়াছে, তাহার মরিবার পুকুরটিও আজ কয়লার ঘেঁস পড়িয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে! একটি টেলিগ্রাফের থাম কেবল সেই মুণ্ডিত দৃশ্যের সাক্ষ্য দিতেছে! কোথায় তাহার সাধের নন্দনকানন, সতীত্বের স্বর্গধাম—তাহা চিনিয়া বাহির করিতে সুলোচনাকে বেগ পাইতে হইল।

সুলোচনা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, এখনও ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তিনী শয়তানী আদুরী তাহার পায়ে কাঁটার মত বিঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

—এখনও তুই আসচিস্? এততেও তোর নিবৃত্তি হলো না? ছিনে জোঁকের মত কেন তুই আমাকে ছাড়চিস্ না? ন্যাখ, আমার আজ কি দশা! কি ভাবে কোথায় এসে দাঁড়িয়েচি।—বলিতে বলিতে সুলোচনার যেন হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিল। আদুরী কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেল।

অতঃপর সুলোচনা সেই নবনির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্মোর পানে তাকাইয়া

দুঃখ প্রকাশ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সুখে থাক্‌লে থাকতে পারতুম, আমি যে রাজার রাণী হতে পারতুম আজ। এই ইন্দ্রপুরী যে আমারই হ'ত। আমার কি-না ছিল, সবই ত পেয়েছিলুম। কিন্তু বিপাকে পড়ে সবই কোথায় হারালুম।

একটা বৃদ্ধ মুসলমান চুড়ীওয়ালা সেই পথ দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল। যদিও তাহার দাড়ীগুলা আজ শণের মত সাদা হইয়া গিয়াছে—তবুও সুলোচনা চিনিতে পারিল। কতবার সে সুলোচনাকে চুড়ী পরাইয়াছে। সুলোচনা জানিতে চাহিল—এটা কাদের বাড়ী, বুড়ো?—আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌ছো?

বৃদ্ধ মুসলমান সবিস্ময়ে বলিল—সে কি মা, তুমি যে আজ এখানে? এ-যে তোমাদেরি বাড়ী, মা। এখানে আর হাঁক দিই না—এখন যে তোমরা বড়লোক—কাচের চুড়ি ত' পর্‌বে না···

সুলোচনাকে শ্রীহীনা অবস্থায় পথে দেখিয়া বৃদ্ধের কেমন সন্দেহ হইল। সে মুসলমান হইলেও বাঙ্গালীর অন্দর-মহলে তাহার প্রবেশ নিষেধ ছিল না। একটা বিপুল বিস্ময় লইয়া বৃদ্ধ আবার কহিল—তুমি কি আর এ-বাড়ীতে থাক না মা? কিন্তু তোমার একটা বহিন্‌কে প্রায়ই দেখি। তোমরা কি উঠে গেছ?

সুলোচনার চোখ দুইটা ছল-ছল করিয়া উঠল, বলিল—হ্যাঁ বুড়ো, আমরা উঠেই গেছি!

বৃদ্ধ তাহার চুড়ীর বোঝা লইয়া বাঙ্গালীদের দ্বারে দ্বারে হাঁকিয়া চলিল।

সুলোচনা আবার সেই ইন্দ্রপুরীর দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দেখিল, বাস্তবিকই তাহার এক 'বহিন্' খড়্‌খড়ির পাখা খুলিয়া পথের পানে চাহিয়া আছে! সুলোচনার সঙ্গে নয়ন ভিড়িতেই

দ্বিতলের সেই নব-নলিনীটি খড়খড়ির পাখি ফেলিয়া দিয়া কোথায় সরিয়া গেল। সুলোচনা এতক্ষণে চুড়িওয়ালার সেই বহিনের আসল অর্থ বুঝিল। কে সে বহিন্, তাহা এতক্ষণে সুলোচনার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে করিতে আপন মনেই বলিল—এইবার কিন্তু মর্‌বো; গঙ্গার জলেই এ জ্বালা জুড়াবো! একবার সুশীলকে আমার দেখে নিই। তার জন্যেই, মর্‌তে-মর্‌তেও এত পথ ছুটে এসেছি! কিন্তু সে কি আর আমায় মা ব'লে চিন্‌তে পারবে? আমি যে তার মা, এ-কথা আজ কোন্ মুখ নিয়ে জানাবো তাকে!

অতঃপর স্বামীকে মনে পড়িয়া গেল। মনে মনে বলিল, তিনিও কি আমার কথা আর ভাবেন। তাঁর পবিত্র স্মৃতি এখন যে আমার মনে আন্‌তেও মাথা হেঁট হয়! যা' গেছে, সারা জীবনটা ধ'রে মাথা খুঁড়লেও জানি আর ফিরে পাব না!…পায়ে ছেড়ে আমি যে তাঁর হৃদয়ে বিরাজ কর্‌তুম। শুধু চরণের দাসী নয়, হৃদয়ের দেবী ছিলুম। তাঁর দোষ কি? মহেশ্বরের মত স্বামী পেয়েও আমি শেষ রাখ্‌তে পারলুম না। আমি যে নিজের মরণ নিজেই ডেকে এনেছি! এখন হায় হায় করেই ত' আমার দিন যাবে।

কপালে করাঘাত করিতে করিতে পুত্রের দর্শনের অপেক্ষায় সেই টেলিগ্রাফের থাম ধরিয়া সুলোচনা দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন শনিবার! স্কুল দেড়টায় ছুটী। সুলোচনা জানিত, সুশীল এখনি বাটি ফিরিবে, কেমন করিয়া পুত্র বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিবে, সেই ভাবনাই সুলোচনাকে দগ্ধ করিতেছিল, তাহার উপর ক্ষুৎ-পিপাসায় ও অবিশ্রান্ত পথ-চলায় ক্রমশঃই সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সুশীল যথাসময়ে বাটীর কাছা-কাছি আসিয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে তাহার অপরিচিতা, উৎকণ্ঠিতা জননীকে পার হইয়া গেল—আর কয়েক

হাত পরেই সুশীল বাটী ঢুকিবে। সুলোচনা সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে গৃহাভিমুখী পুত্রের দিকে ছুটিল। কেমন করিয়া সে আজ পুত্রকে আত্মপরিচয় দিবে! কেমন করিয়া সে পোড়া-মুখ দেখাইবে, কিছুই ঠিক পাইতেছিল না। অথচ অবিলম্বে না ডাকিলেই নয়। উর্দ্ধশ্বাসে সুলোচনা ডাকিয়া বলিল—বাবা, শোন ত' একটিবার……

সুশীল ফিরিয়া দেখিল—উৎকণ্ঠিতা এক রমণী! জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে আপনি ডাক্‌চেন?

সুলোচনা সকাতরে জানাইল—তোমাদের বাড়ী থেকে আর একটু তফাতে এস বাবা,—তোমাকেই আমি ডাকছি!

সুশীল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে আপনি?

সুলোচনা অতি কষ্টে জানাইল—বাবা সুশীল, আমি তোমার দুঃখিনী—অপরাধিনী মা।

সুশীল রোমাঞ্চিত হইয়া বিপুল সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল—মা? আমার মা ত' ইহ-জগতে নেই। তিনি যে অনেক কাল মারা গেছেন! বাবা বলেন, ওই ডোবাটায় আমার মা ডুবে মরেছেন। আমি তখন বড় ছেলেমানুষ ছিলুম। একটা আব্‌ছায়ার মত এখনও তাঁকে আমার কিছু কিছু মনে পড়ে!

বিস্ময়াবিষ্ট-নয়নে সুশীল তাহার পূর্ব্বস্মৃতিকে সুলোচনার মুখখানার ভিতর হাত্‌ড়াইতে লাগিল, একটা পূর্ণতা ও অপূর্ণতার ঘোরতর দ্বন্দ্বে সুশীল যেন মূঢ়ের ন্যায় তাহার ফিরে-পাওয়া জননীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলোচনা শুধাইল—তোমার বাবা যা' বলেছেন,—তোমার আসল মা যে এ-পৃথিবীতে আর নেই, সে-কথা বড় মিথ্যে নয়। কেবল সেই অভাগিনীর কৃত্রিম ছায়াখানি এখনও এখানে হা-হা করে' বেড়াচ্চে—সে ছায়া আমিই।

সুশীল অগ্রসর হইয়া জানিতে চাহিল—তবে সত্যই কি আপনি আমার মা? বাবা কি এতদিন আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে ওই কথা বল্‌তেন?

সুলোচনা অশ্রু-সিক্ত নয়নে জানাইল—হ্যাঁ সুশীল, আমি মরতে গিয়েও মরতে পারিনি। বড় কষ্টেই আমার রাত-দিন কেটেছে বাবা, খালি তোমাকে একটিবার না দেখে মরতে আমার ইচ্ছে ছিল না। তাই এ-প্রাণ নষ্ট করবার আগে, তোমাকে আমি দেখে যেতে এসেছিলাম। আমার সে সাধ মিট্‌ল। এখন তুমি ঘরে যেতে পার বাবা। কেবল যাবার আগে, একবারটি তোমার চাঁদমুখে আমাকে 'মা' বলে ডাকো।

সুশীল উদাস-নেত্রে বলিল—কি বল্‌চো মা, আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনি!

সুলোচনা পুত্রের নিকটস্থ হইয়া পুত্রের অবনত মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিল বাবা, আমার কাহিনী তোমার বুঝ্‌বার কোন আবশ্যক নেই, কেবল সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র জেনে রাখ, আমি তোমার অতি-বড় অভাগিনী মা! তোমার উপর যে অন্যায় আমি দেখিয়েছি—বল বাবা, তা' তুমি ক্ষমা করেছ? কি অন্যায়, তাও তোমার জান্‌বার দরকার নেই!—সুলোচনা ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল।

সুশীল অনুরোধ করিল—মা, আমাদের ঘরে চলো!

সুলোচনা জানাইল—বাবা, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হ'তে পারে—সেও সম্ভব, কিন্তু আমার পক্ষে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ!

সুশীল পাগলের ন্যায় বলিল—মা, তবে আমি তোমার সঙ্গেই যাব—দাঁড়াও, এই দণ্ডেই যাব।

সুলোচনা বলিল—বাবা সুশীল, তোমার ক্ষমা আমি পেয়েছি! এইবার তোমার অপরাধিনী মাকে মন থেকে মুছে ফেল। আমার তো ঘরবাড়ী নেই বাবা, আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে? মনে ভাব, এ-জন্মে তোমার 'মা' ছিল না···যাও দুলাল আমার, আজ্‌কের ঘটনা তোমার জীবনে অপূর্ব্ব হলেও কাকেও কিছু জানিয়ো না। আমি না থাক্‌লেও, আমার আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে রইল বাবা।

সুলোচনা আর দাঁড়াইল না। এক-পা এক-পা করিয়া চলিতে লাগিল। আতুরীও অনুসরণ করিতে ভুলিল না।

সুশীল বিমূঢ়ের ন্যায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে এক সময় কাঁদিয়া ফেলিল।

আজ বিমলচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বত্রই সফলতা। বালা-স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, দাস-দাসী, গাড়ী, বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী যাহা কিছু প্রয়োজন সবই অতিরিক্তভাবে, বিনা চেষ্টায়, আশাতীত প্রাচুর্য্যে আসিয়া পড়িয়াছে, আসে নাই কেবল মনের সুখ। রেথার ন্যায় বাঞ্ছিতা অথচ অনুগতা স্ত্রীরত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াও বিমলের নিদ্রা আসে না, রজনী পোহায় না, দুগ্ধফেননিভ শয্যাকে কাঁটার খোঁচা বলিয়া মনে হয়। শরৎ আসে, বসন্ত আসে, জ্যোৎস্না হাসে, রজনীগন্ধা ফোটে, শেফালিকা ঝরিয়া যায়—বিমলকে স্মৃতির আগুনে দগ্ধ করিতে! জীবনের পুরাতন-পঞ্জিকা যখনই উল্টায়, সুলোচনার মুখখানি—তাহার স্পর্শসুখ যখনই আলোচনা করে, অনুভব করে, তখনই এত যে সাজানো সংসার, সবই বিষাদের অশ্রুজলে অস্পষ্ট হইয়া উঠে! স্ত্রী ত' অনেকেরই হয়, স্ত্রী ত' অনেকের বাহির

হইয়াও যায়, আবার ভ্রান্তি আসে, আবার তাহার স্থান পূর্ণ হয়; কিন্তু বিমল যে-ভাবের স্ত্রী হারাইয়াছে, তাহার অভাব যে পূর্ণ হইবার নয়!

বিমল তাহার জীবনের অকথ্য যন্ত্রণার ব্যাধি—রেখাকেও লুকাইয়া চলে। সুশীলের ত' ধারণাই জন্মিয়া গিয়াছে তাহার মা ডোবায় ডুবিয়া মরিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী যাহারা, তাহাদের গায়ে কোনরূপ যন্ত্রণার আঁচ লাগিতে দিব না, অথচ নিজে মনাগুনে পুড়িয়া মরিব—বিমলের ইহাই ছিল সংকল্প। কিন্তু হায় রে, এত সতর্ক হইয়া চলিয়াও, বিমলের দীর্ঘশ্বাসই তাহাকে অন্যের নিকট ধরাইয়া দেয়। বিমল মনে মনে ভাবে—আমি যেমন জ্বল্‌চি, আমার চেয়েও সে কি দ্বিগুণ জ্বল্‌চে না? জ্বল্‌চে বই কি। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ আমারই, আমি বন্ধু বিবেচনায় বিশ্বাস-ঘাতককে গৃহে স্থান দিয়েছিলাম, ভাল করে তাকে রক্ষা করতে পারিনি—ভাবিনি সে স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের মতই দুর্ব্বল। বিমলের অন্তঃস্থল হইতে সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে!

রেখা সেই দীর্ঘনিশ্বাসে ব্যথা পাইয়া জিজ্ঞাসা করে—কেন আপনি এত ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, কোথায় আপনার ব্যথা, আমি যে কিছুই তার বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

বিমল বলে—তোমার বুঝে দরকার নেই, রেখা। কেবল তুমি আমার সুশীলকে স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখো।

রেখা আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করে—সুশীলের মায়ের জন্যই বোধ হয় আপনি এত দুঃখ করেন? তাঁর কাছে যে যত্ন, যে ভালবাসা পেতেন, তার কিছুই বোধ হয় আমার কাছে পান না?

বিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, রেখাকে বুকে চাপিয়া বলে—রেখা, তুমি যে আমার হৃদয়ের সান্ত্বনা, রেখা! আমার আজ যা-কিছু দেখ্‌চ, এ সবই

তোমার ভাগ্যের ফল! তার কথা আর তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো না।...

একদিন রেখা জানাইল—ওই ডোবাটাকে আপনি বুজিয়ে দিন! ওই ত যত স্মৃতি আপনার মনে জাগিয়ে দেয়। দিদি যেমন পা পিছ্‌লে ওতে ডুবেছেন, আমারও যদি কখনও তেমনি করে পা পিছ্‌লে যায়! তা হলে হয়ত আমাকেও একদিন হারাবেন। সরলা রেখাও তা'র দিদির ডুবে-মরাটা সত্য মনে করিত, তাই সে অমনভাবে নিবেদন করিল।

—তুমিও মর্‌বে রেখা, সে হতভাগীর মত তুমিও মর্‌বে? উঃ, কী সে দুর্ব্বিসহ মৃত্যু! সে শুধু নিজে মরেনি রেখা, একটা সংসারকেই মেরে রেখে গেছে। বিমলের আকস্মিক একটা দম্‌কা দীর্ঘশ্বাসে ঘরের সমস্ত দ্রব্যসম্ভারই যেন দুলিয়া উঠিল।

তরুণী রেখা আবার সকাতরে জানিতে চাহিল—আপনি দিদিকে বড়ই ভালবাস্‌তেন, নয়? আর আপনার চেয়েও তাঁর ভালবাসা বোধ হয় অনেক গভীর ছিল—তা না হ'লে, এত ক'রেও তাঁ'কে ভুল্‌তে পারছেন না কেন?

—তার স্মৃতি যে মোছবার নয়, রেখা, এত সৌভাগ্য পেয়েও, তোমার মত জুড়াবার বক্ষ পেয়েও তাকে আর ভুল্‌তে পারলুম কই? স্মৃতির বেদনায় প্রাণ আমার মরুভূমি হ'য়ে রইলো!

সুশীল বেড়াইয়া আসিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দাঁড়াইল। মানুষের মনের অবস্থা চোখে প্রকাশ পায়, হৃদয়ের গুরু-ভার দৃষ্টিতে মাপা যায়।

রেখা ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুশীল, আজ তোর মুখখানা এত ভারি কেন রে? দেখ্‌লুম, কেঁদে কেঁদে বালিশটা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে

ফেলেচিস্। বেড়িয়ে এলি, এখনও সেই ভাব। জলখাবার দিলুম, তা'ও ফেলে চলে গেলি। কেন, কি হয়েচে?

কাঁদ কাঁদ ভাবে সুশীল বলিল—আমার মনের ধিক্কারে আমি কাঁদ্‌চি মা,—আমার এ কান্না তুমি সহজে বুঝতে পার্‌বে না।—বলিয়া সুশীল দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিল। তারপর চোখ মুছিয়া—কতকটা শান্ত হইয়া বলিল—বাবা, আপনি উঠে আসুন, একটা কথা আপনার কাছে—আজ জান্‌তে চাই। কিন্তু এখানে নয়, সে-কথা মাকেও শোনানো হবে না।

পিতা-পুত্রে নিভৃতে চলিয়া গেল। রেখা ভাবিল, কি এমন গোপন কথা, যা সুশীল আমাকেও জানাতে চাইলে না!

রেখা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পা টিপিয়া টিপিয়া পিতা-পুত্রের অনুগমন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি-স্নান

এখনও তুই আস্‌চিস্? কিন্তু আজকে আমার শেষ দিন, তা জানিস্? আমি এমন এক রাজ্যে চলে যাচ্চি, যে রাজ্যে ম'লেও আর তুই আমার পিছু নিতে পার্‌বিনি।

আদুরী এখনও সুলোচনার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আদুরী জিজ্ঞাসা করিল—কেন, আজ সত্যিই মর্‌বে নাকি? সেই জন্যেই বুঝি দড়ি-কলসী কিন্‌লে?

সুলোচনা জানাইল—হ্যাঁ, সেই জন্যেই। আজ এই ভরা-গঙ্গায় আমি দেহ রাখব—নইলে তোর হাত আর এড়াতে পার্‌ব না। সকলেই আমাকে ছেড়েচে, কেবল তুই-ই ছাড়্‌চিস্ নি। পথে বসিয়েও তুই কাঁকরের মত বিঁধচিস্।

আদুরী বলিল—দিদিমণি, কেন তুমি মর্‌বে? এমন নধর যৌবন, অত রূপ, এত সুন্দরী তুমি, কেন তুমি এ পৃথিবীর মায়া ছাড়্‌বে? চল, ফিরে চল। আমি তোমাকে পথ বলে দেবো—তোমার দাসীবৃত্তি কর্‌বো। পুরুষ তোমাকে কাঁদিয়েচে—তুমি পুরুষকে কেন কাঁদাবে না?

সুলোচনা উপরের দিকে চাহিয়া—করযোড়ে জানাইল—হায় জগদীশ্বর, নারীর সর্ব্বনাশ নারীই ত বেশী কর্‌ছে। পুরুষ আমার সর্ব্বনাশ করেছে বটে, কিন্তু নারীর মত নয়। এ না সাহায্য করলে হয় ত এতদূরে আমি গড়াতুম না। রাবণের চেড়ীর মত এ আমাকে আজ, পাহারা দিচ্চে।

সুলোচনা দড়ি ও কলসীটি লইয়া একটা আঘাটায় গিয়া নামিল। পাছে ডুবিয়া মরে এই ভাবিয়া আদুরী সুলোচনার অগ্রেই জলে নামিল।

নিকটেই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী—গঙ্গা-তীরের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !

ও-পারে বেলুড়মঠ, সাঁঝের নিরালায় ডুবিয়া যাইতেছে।

শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ উজ্জ্বলতায় সবেমাত্র শঙ্খ-শুভ্রতা ধারণ করিতেছে। আলোকে-আঁধারে সন্ধ্যা যেন মূর্ত্তিমতী! এমনি সন্ধিক্ষণে আজ সুলোচনা চিরদিনের মত—চির-রাত্রির দেশে ডুবিবে—কলসী-দড়ি সব প্রস্তুত !

সুলোচনা পুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই সর্ব্বাগ্রে ঐ মৃত্যুযন্ত্র দুইটি কিনিয়াছে। পাছে শুধু ডুবিলে আবার ভাসিতে হয়, সাঁতার কাটিতে হয়, হয়তবা শেষে কূলেই উঠিতে হয়, তাই পূর্ব্ব হইতে এত সতর্ক আয়োজন।

সুলোচনা কলসীর গলায় শক্ত করিয়া দড়ি বাঁধিয়াছে, জলে নামিয়া কলসীও ডুবাইয়াছে, এইবার গলায় বাঁধিবে তারপর ডুবিবে—আর ভাসিবে না।

কিন্তু ঠিক মরণের সন্ধিক্ষণে, এ কার বেলা-শেষের গান সুলোচনার কর্ণে আসিল। গানের সুরের মিষ্টতায় ও ভাবের গভীরতায় সুলোচনা আসন্ন মৃত্যুকে যেন ভুলিয়া রহিল, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল—

—অগতির গতি, জগতের পতি
পীড়ন কি অতি তোমারে সাজে ?
অসিটি দেখালে, বাঁশীটি লুকালে
একি অবিচার তোমারি কাজে ?

গান থামিল। আবার সেই সন্ন্যাসিনী, সেই ভিখারিণী, নারী-শিরোমণি বিরজা সঙ্গীত এবং ইঙ্গিতকে পথের সঙ্গী করিয়া পথে নামিয়াছে···

সুলোচনার জীবনের একদিকে যেমন আদুরী, অন্যদিকে তেমনি বিরজা। একদিকে শয়তান, অন্যদিকে তেমনি ভগবান।

বিরজা জিজ্ঞাসা করিল—কি বোন্, চিনতে পারছো? এমন সন্ধ্যায় যে আজ গঙ্গাস্নানে! মুক্তি-স্নান না কি? উঠে এস, একটা কথা কই।

সুলোচনা বুকে বল পাইল, উঠিতে উঠিতে বলিল—দিদি, তুমি এসেছ? আমি আজ মরবো বলেই জলে নেমেছিলুম।

—তাই এ দড়ি-কলসীর ব্যবস্থা বুঝি?

—হ্যাঁ দিদি, কেবল গলায় বাধতেই বাকী রেখেছিলুম, এমন সময় তোমার গান শুনতে পেলুম—মরা আর হ'ল না।

—তবে আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েচি, না? অপমৃত্যুর পথ থেকে এইবার আমার বাঁশীর পথ ধরবে চল! যে ক'টা দিন বাচ, আমার গান শুনে মনকে বাঁধতে চেষ্টা করো। চল, একটা নতুন পথ তোমাকে দেখিয়ে দিই।

আহুরী বিরজার ভয়ে আরও গভীর জলে নামিয়া একবার ডুবিতেছিল আবার উঠিতেছিল, হঠাৎ দূর হইতে শুনা গেল—ওমা, রক্ষা করো— হাঙ্গরে আমার পা'টা কেটে নিয়ে গেল গো!

বিরজা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—কি হ'ল—গঙ্গার বুকে এমন আর্ত্তনাদ কেন?—কে—?

সুলোচনা জানাইল—পাপের শাস্তি দিদি। আজ সত্যিই আমার মুক্তি-স্নান। শয়তান আমার কাঁধ থেকে আজ নেমে গেল—পায়ের কাঁটা খ'সে পড়ল। এইবার অন্ধকে হাতে ধরে—পথে নিয়ে চলো দিদি—আলো দেখাও।

আহুরীকে আর উঠিতে দেখা গেল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীর সংসার

বঙ্গের নবদ্বীপ। যেখান হইতে জগতের নূতন সংস্করণে বিশ্বপ্রেম ও সাম্যের মহাবাণী প্রচারিত হইয়াছিল, জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাষণ্ডগণও উদ্ধার পাইয়াছিল, হরিদাস যবন হইয়াও হিন্দুর আরাধ্য এবং গুরুস্থানীয় হইতে পারিয়াছিলেন—মহাপ্রভুর সেই প্রেমাশ্রু-সিঞ্চিত উদয়-স্থানে বাণেশ্বর ভারতের কি অভাবনীয় ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন! এক অপূর্ব্ব সংসার—অসংখ্য মানবপরিবার তাঁহার ক্ষমার শাসনে যেন প্রাণময় হইয়া উঠিল!

আজ নমোশূদ্র সেখানে উপেক্ষার পাত্র নহে, হিন্দু-মুসলমান সেখানে গোপাল এবং হলধর হইয়া একই মায়ের দুইটি স্তনে মানুষ হইতেছে! কৈ, জননীর স্নেহার্দ্র-বক্ষের ত জাতি যায় নাই? জল ত অচল হয় নাই।

বাণেশ্বর আজ অতর্কিতে তাঁহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় হইতে আসিয়াছেন! এতদিনের পর বুঝি তাঁহার জগদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বাণী আসিয়া পৌছিয়াছে!

একটা প্রশ্ন বাণেশ্বরকে এ কয়দিন ধরিয়া বড়ই বিচলিত করিতেছিল

—মহামায়ার এই পুণ্যের সংসারে কোথাও কোন পাপ প্রবেশ করে নাই ত’? আমার নিজের কোন অপরাধ জন্মায় নাই ত?

বাণেশ্বর সকলকে ডাকাইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—দেখ, এবার আমি অবসর গ্রহণ করব—তোমরা আশ্রমের দায়িত্ব যে-যা’র বুঝে নাও।

বৃদ্ধ কৈলাস নিবেদন করিল—আশ্রমের এমন উন্নতির সময় তুমি বিদায় নিতে চাও জামাইবাবু, মায়েরা সব এত কাজ পেরে উঠ্‌বে কেন? এমন সন্ন্যাসীর সংসারকে আনন্দ-বাজারে পরিণত করে হঠাৎ সকলকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে ফেলে যাওয়া কি তোমার উচিত ঠাকুর?

—কি বল্লে কৈলেস? সন্ন্যাসীর সংসার? এখনও তোমার আমি জামাইবাবু, আমার সংসার? তবে সত্যই কি আমার এই আশ্রমের উপর একটা আসক্তি এসে জন্মাচ্চে? এরা যাই ভাবুক আমি ত’ ভেবে আস্‌চি, এখানকার যা’ কিছু সবই সচ্চিদানন্দময়ী বিশ্বেশ্বরীর খেলা—আমার নয়। আমি কে? আমি কতটুকু? যতদিন পর-দুঃখকাতরতার বেদীর উপর এই আশ্রম দণ্ডায়মান, আমি থাকি আর না থাকি, ততদিন এর বিনাশ নেই। আর যদি এখনি তাঁর ইচ্ছায় অকারণেই আগুন জ্বলে ওঠে, তাতেও আমার দুঃখ নেই, আমি হাসিমুখে আবার নিজের ভূমিতে ফিরে যাবো! আমি বুঝ্‌ব, ওই বাঁধনহারা পথেই তিনি আমাকে ডাক্‌চেন! কৈলেস, ঠিক জেনো, আমি তোমাদের কিছুতেই লিপ্ত নই।

সন্ন্যাসীর সংসার!—এই প্রশ্নই বাণেশ্বরকে আজ ফিরিবার পথে দংশন করিতে লাগিল। অতঃপর একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাণেশ্বর জানাইলেন—আমি চল্লুম কৈলেস মায়ের কাজ এবার মা করুন।

কৈলাস নিকটস্থ হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল,—আমার বেয়াদবী

মাফ করুন বাবু, আমি যে পুরাণো জিনিষটাকে ভুলতে পারি না কিছুতেই, তাই অনেক যা-তা কথা বলে ফেলি, আমার ঘাট হয়েচে বাবু!

—না কৈলেস, এবার আমাকে ছুটি দাও। আমি বাস্তবিকই একটা বিস্তীর্ণ মায়ার রাজ্যে গিয়ে পড়্‌চি—আমি অনধিকারীকেও অধিকার দিয়ে ফেল্‌চি। এতে আমার যেন গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা হচ্চে। এইবার আমি সাম্‌লে নিয়ে ফিরে যেতে চাই।

—কৈলাস জানাইল, তবে আমরাও আর কেন থাকি বাবু? যারা ছোট ছিল, তারা ত' এখন বড় হ'য়ে উঠেচে, তাদেরই হাতে এ-সব তুলে দিয়ে আমরাও তোমার সঙ্গে তীর্থে চলে যাই।

—বেশ, কিন্তু যদি কখনো প্রয়োজন হয়, এই আশ্রমের মঙ্গলের জন্য তোমরা আবার ফিরে এসো।

অতঃপর বাণেশ্বর ভবেশকে ডাকিয়া বলিলেন—ভবেশ, আমার শেষ কাজ—তোমাকে সংসারী করে যাওয়া। এই আশ্রম-কলিকা মঞ্জুশ্রী—যাকে আমরা দেশের গোঁড়ামীর জন্যে পাত্রস্থা করতে পার্‌ছি না, তুমি তা'কে গ্রহণ করে এই আশ্রমেরই একজন সেবক হও।

বাণেশ্বর অবনত নয়না কুমারী মঞ্জুকে ভবেশের সম্মুখে দর্পণের ন্যায় ধরিলেন।

ভবেশ সেই অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একান্ত মিনতি সহকারে গুরুদেবকে জানাইল—ঠাকুর, মার্জ্জনা কর্‌বেন। যাবার সময় আমাকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করবেন না। বারাণসী জলে আমার মনোময়ী প্রতিমা-বিসর্জ্জন কি এই জন্যে? এরই জন্যেই কি এতকাল ধ'রে আপনার অনুসঙ্গ-লাভ করেছিলুম? আমার প্রতি আজ কেন এমন বিমুখ হচ্চেন?—জ্ঞানতঃ কোনো অপরাধ করেছি বলে তো মনে পড়ে না প্রভু।

বাণেশ্বর বুঝাইলেন—বৎস, তোমার উপর আমার পুত্রাধিক স্নেহ, কিন্তু কে যেন আমাকে বলাচ্চে—'তুমি ফিরে যাও।' সংসারের পথে যাও—যশের পথে ফিরে যাও—এ নীরস মার্গ তোমার নয়! হিমালয়ের বন্ধুর পথ তোমার নয়।—তুমি এ বাংলা দেশের কোমল মাটির ছেলে—তুমি মৃণ্ময়-পাত্র! উত্তরাখণ্ডের নির্ম্মম পাথরকে আলিঙ্গন করতে তুমি যেও না—

—আমাকে নিরাশ করবেন না প্রভু। আকাশ-বক্ষে যেমন পক্ষীর স্বাধীনতা, অগাধ সাগরে যেমন মীনের স্বাধীনতা, প্রকৃতির বিচিত্র অঞ্চলে আমিও যে তেমনি স্বাধীন পুত্র।—বলিয়া ভবেশ তাহার গুরুদেবের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিল।

বাণেশ্বর বলিলেন—ভবেশ, তুমি আমার প্রাণের চেয়েও আদরের, মঞ্জুশ্রী আমার কলিজার মতই মমতার। তোমাদের মিলন আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা!

ভবেশ মৌন হইয়া রহিল—আর কোন কথা কহিল না।

এমন সময় দীনবন্ধুর সেবাশ্রম বেলুড় হইতে আশ্রমের ডাক্তার বিমল বাবুর প্রেরিত একটী 'তার' আসিল যে, সুষমাকে যেন অতি শীঘ্র বেলুড় আশ্রমে পাঠানো হয়—সুষমার স্বামী অন্তিমকালে তাহার দর্শন-প্রার্থনা করিয়াছেন।

সেই দিনই বাণেশ্বর সদল-বলে বেলুড় যাত্রা করিলেন।

বেলুড়ের গঙ্গা-তীরে কর্ম্মপ্রাণ দীনবন্ধুর সেবাশ্রম। তাহার নানা সদনুষ্ঠানগুলি কেবল মিশনের হাতেই ন্যস্ত নহে—আপদোদ্ধারের এত

বড় একটা কার্য্য বিনা বিজ্ঞাপনে কেবল একমাত্র 'হাত' আর 'হৃদয়ের' গুণে নীরবে এবং নির্ব্বিবাদে সম্পাদিত হয়।

দীনবন্ধু নিজে দাতা এবং নিজেই সেবক। দাতা দীনবন্ধু যাহা করে, স্বহস্তে করে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া করে, বিপদকে আলিঙ্গন দিয়া করে—ঘরে বসিয়া থাকে না। হতাশের বন্ধু দীনবন্ধু কেবল এইটুকু মাত্র বিজ্ঞাপন দেয়—"আত্মহত্যার পূর্ব্বে একবার আমাকে জানাইও, কুল-ত্যাগের পূর্ব্বে আমাকে খবর দিও—উপবাসী রহিবার পূর্ব্বে আমি যেন জানিতে পারি!" এ ভাবের বিজ্ঞাপন জগতে বিরল। অথচ দীনবন্ধু বাংলার 'রথচাইল্ড' নহে! কেবল অর্থেই কি সেবার কার্য্য হয়?—সেবা-প্রাণ হওয়া চাই!

কে ওই মুমূর্ষু, সন্ন্যাসী, আজ সেবাশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে—আর তা'র পার্শ্বেই কে—ওই সেবানিষ্ঠ সংসারী, সেই পরলোক-যাত্রীর চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিয়াছে? একটি ক্ষমার ভিখারী, আর একটি ধৈর্য্যের সহ্যাদ্রি। একটি স্ব-কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তকারী মৃত্যুর তীরবর্ত্তী অসাধ্য রোগী, অপরটি কর্ত্তব্যে অটল, চরিত্রে সু-মহান্, মহাশত্রুরও জীবন-রক্ষক—আকাশের ন্যায় প্রশান্ত-মূর্ত্তি! কে ইহারা, আজ ক্ষমার মহামিলন-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত!

আজ মহেন্দ্রকে বাঁচাইবার জন্য বিমলের কি আপ্রাণ প্রয়াস। চিকিৎসা-শাস্ত্রের হেন পদ্ধতি নাই, যাহা বিমল অবলম্বন করে নাই।

মহেন্দ্র বিমলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া-শুনিয়া অবাক্! বিমল আজ একাধারে চিকিৎসক, সেবক এবং অনিদ্র-প্রহরী! যে বিমল মহেন্দ্রের পাশবিকতার জন্য এককালে জন-সাধারণের কাছে ছাতা আড়াল দিয়া চলিত, এখনও যাহার কথা মনে পড়িলে লোমহর্ষণ হয়, দীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়ি হয়, সেই বিমল মহেন্দ্রের পাশে অভিনিবিষ্টচিত্তে

সেবাপরায়ণ হইয়া বসিতেছে, উঠিতেছে, গভীর অধ্যয়নে মগ্ন আছে, স্পুটাম পরীক্ষা করিতেছে, বক্ষে ষ্টেথিস্‌কোপ্‌ বসাইতেছে, দুইবেলা ধরিয়া থার্ম্মোমিটার দিয়া জ্বরের উঠা-কমা টুকিয়া রাখিতেছে, পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে, অথচ কোনরূপ গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছে না—এতই ধীর এবং সমাহিত-চিত্ত! ইহা ছাড়া, বিমল মহেন্দ্রকে বাঁচাইবার অনুকল্পে অশেষ উৎসাহ দিতেছে।

মহেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—কেন ভাই, তুমি বৃথা চেষ্টা কর্‌চো? আমার গুরুদেব যে হাল ছেড়ে দিয়েই কেবল তোমাদের নিকট ক্ষমার ভিখারী করে আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাদের সংঘাতই যে আমার জীবনের গতি ফিরিয়েছে—এইটা জানাবার জন্যই আমি আজ মর্‌তে মর্‌তেও তোমাদের দ্বারে উপস্থিত। বলো, মার্জ্জনা কর্‌লে?

বিমল বলিল—মহেন্দ্র, স্থির হও। উত্তেজনায় তোমার চিকিৎসার ব্যাঘাত হবে—তোমার গুরুদেবের মত আমাকেও তোমার জীবনের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

—কা'কে বাচাচ্ছো ভাই?—তোমার এই ভীষণ শত্রুকে? যে তোমার বুকে আজও শেল বিদ্ধ করে রেখেছে—তুমি সেই পাষণ্ড অকৃতজ্ঞকে বাঁচাবে? তার চেয়ে এই বিশ্বাসঘাতককে কোন বিষের শিশি এনে দাও। তুমি নিজে না পার আমাকে দাও—এক নিমিষে সব ফুরিয়ে যাক্‌।

বিমল দৃঢ়চিত্তে জানাইল—মহেন্দ্র, এখন এই মাত্র জানি, আমি চিকিৎসক আর তুমি আমার রোগী। আর কোন কথাই আমার মনে আস্‌চে না। তুমি স্থির হও, আমার নিষেধ শোন।

—আমি তোমার যে মহাশত্রু। তোমার কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী।

—সে অপরাধ বিচার করবার ভার আমার নয়,—তোমার জীবনই এখন আমার একমাত্র স্থির লক্ষ্য। চিকিৎসকের কর্ত্তব্য আমাকে পালন করতে দাও!

—কি মহৎপ্রাণ তুমি বিমল! আমি তোমার হাতে বাঁচ্‌তে আসিনি, কেবল তোমার ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি আজ পারের যাত্রী। হাসি-কান্নার এ-তীর থেকে বলো, তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লে?

উদার-প্রকৃতি বিমল বলিল—আমি যে-মুহূর্ত্তে তোমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছি, সেই দণ্ডেই আমি সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তোমাকে ক্ষমাও করেচি মহেন্দ্র।

এমনি সময়ে সকলেই নবদ্বীপ হইতে আসিয়া পড়িলেন। সুষমা এক সুকুন্তল বালকের হাত ধরিয়া মহেন্দ্রের পদপ্রান্তে অতি বিষণ্ন-নয়নে দাঁড়াইল। সুষমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্তম্ভিতের ন্যায় দেখিল—শায়িত এক মুমূর্ষু সন্ন্যাসী, মস্তকে রুক্ষ কেশভার, বক্ষে একরাশ দাড়ী, দেহ কৃশ, চক্ষু কোটরগত—তাহার স্বামী বলিয়া আর চিনিবার উপায় নাই!

একি সেই মানুষ?—একটা অপার বিস্ময়ে সুষমা কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—সুষমা, আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমিই যে তোমার সেই অযোগ্য স্বামী, মহেন্দ্র। দেবী, এজন্মে তোমার মূল্য আমি বুঝতে পারিনি,—তাই আমার আজ অপরিসীম অধঃপতন!—সুষমা, তোমাকে শেষ-দেখা দেখে যেতে এসেচি—তোমার সুদুর্লভ ক্ষমার ভিখারী হয়ে ওই নির্ব্বিকার দেশে চলে যেতে চাই! ক্ষমা করো—সুষমা।

সুষমার মনে একে একে সব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এক-একবিন্দু অশ্রুতে এক-একটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নানা দিক্ হইতে কি যেন একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা নানা রূপ ধরিয়া আজ প্রকাশ্যে সংযমের

বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু পাছে সে প্লাবনে স্বামীর জীবনের কোন ক্ষতি হয়, এইজন্য সাধ্বী সুষমা সেই উৎপ্লাবিত বিধি-দত্ত ঝর্ণা দুইটীকে আপনার সাহস-শক্তিতে চাপিয়া পার্শ্বে গিয়া অতি দুঃখেই বলিল—আহা, এমন ভাবে নিরাশ্রিতের মত পড়ে রয়েচ? তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েচ। জীবনটাকেও কি এমনি ক'রে দগ্ধে' দগ্ধে' হত্যা কর্‌তে হয়! তোমার চিরদিনের দাসী থাক্‌তে, তুমি আজ এমন ভাবে এসে এখানে পড়েচ!

অতঃপর সুষমা বিমলচন্দ্রের পায়ে ধরিয়া নিবেদন করিল—বিমল-দা, আমার পরম গুরু স্বামীকে বাঁচাও!

সে দৃশ্যে পাষাণও গলিয়া গেল। বিমল বাবুর চক্ষেও জল আসিল। বাংলাদেশের প্রতিভার বর-পুত্র—নূতন সত্যের অগ্রগুরু ভবেশ বুঝিল—হিন্দু-নারীর সতীত্বটা কেবল কুসংস্কার নহে—স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাহার সম্বন্ধ বিস্তৃত—কেবল সমানে সমানে ভাড়াটিয়া প্রেমের বেচা-কেনা নহে—প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে।—ভারত-নারীর প্রেম এপার-ওপারের সেতু—নারী-মাধুর্য্যের চিরন্তনী পতাকা।

মহেন্দ্র সবিনয় অনুরোধ করিল—ভাই, তোমরা সকলেই একবারটি অন্তরালে যাও। আমি আমার দেবীর কাছে শেষ ভিক্ষা চেয়ে নিই।

একমাত্র সুষমার করধৃত সেই অনাথ বালক ব্যতীত সকলেই সে-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

মহেন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—সুষমা, তোমার নারীত্বের মর্য্যাদা আমি রক্ষা করিনি—তোমার মত স্ত্রীরত্ন লাভ করেও হেলায় হারিয়েছি। নানা অন্যায়ের সৃষ্টি করে আমি নিজেকেও ক্ষয় করে ফেলেচি—এক লহমাও আমার সুখে কাটেনি! পাহাড়পুরের জঙ্গলে গুরু মাধবাচার্য্যের আশ্রমে এতকাল ছিলাম। আমি তোমার উপর যে অধর্ম্ম করেচি, তাতে

আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য! পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' হয় নি—না জানি আরও কত শাস্তি ভগবান্ আমার জন্য তুলে রেখেছেন।

সুষমা স্বামীর সম্পূর্ণ-পরিবর্ত্তিত কৃশ এবং বিকৃত মুর্ত্তিখানি লক্ষ্য করিয়া বলিল—কই, পূর্ব্বের সে দেহখানাও ত' আর নেই! হায়! এতটাই তুমি বদ্‌লে গেছ! অসময়ে তোমার সেবা করতে আমি পেলুম না—আমার এমনি মন্দ অদৃষ্ট!

—তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো বলেই তো আমি সন্ন্যাসীর আশ্রম ছেড়ে দুরারোগ্য যক্ষ্মার রোগী হ'য়েও এতদূর পথ হেলায় অতিক্রম করে এলাম—সুষমা, আমি নতুন মানুষ হয়েচি—দেহ দিয়ে আমি আজ আত্মাকে ফিরে পেয়েচি সুষমা। তোমাদের উপর অত পাপ করেছিলুম বলে, আজ আমার এই পথ। ভগবান্‌কে জানাও, যেন আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ করি—সে জন্মে আমার যেন সদ্গতি হয়। এই দেহ আমার অনেক অনিষ্ট করেচে—এর বিনাশই এখন মঙ্গল। কিন্তু তুমি আমার একটি প্রার্থনা রাখ্‌বে কি? বল, তুমি আমায় ক্ষমা করলে—আমার শত অপ-রাধ এক নিমিষের দেখায় ভুলে গেলে?—বলিয়া মহেন্দ্র সকাতর-দৃষ্টিতে সুষমার বিষাদ-মলিন অশ্রুবিহ্বল মুখখানির প্রতি তাকাইয়া রহিল।

—আমার শূন্য মন্দিরের অখণ্ড দেবতা তুমি, আমার শ্মশান-বক্ষের জ্বলন্ত স্মৃতি তুমি, তোমাকে ছাড়া আমি যে জগতের আর কা'কেও একান্ত ভাবে জানি না! তোমার শত অত্যাচারকেও আমি রোগ বলে ভেবে নিয়েচি। তবে দুঃখ এই, সে রোগের আমি কোন প্রতিকার করতে পারলুম না। এজন্মে হ'ল না, কিন্তু পরজন্মে তুমি আমার হয়ো। তুমি জান না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

বলিয়া সুষমা অশ্রু মুছিতে লাগিল।

—এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক এই পলাতক যে এখনও তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারে, তা আমি ভাব্‌তেই পারি না। তুমি তো হেয়, ঘৃণ্য, অপবিত্র নও। তুমি দেবী—দেবতারই পূজার যোগ্য—দেবতারই মাথার পুষ্প—আমার মত শয়তানের তুমি নও, তবুও সুষমা, এই মিনতি আমার, দেহান্তের পর তোমার হাতের পবিত্র অগ্নি যেন আমি পাই।

—কি বলচ, তোমার এই পুত্র বর্ত্তমান থাক্‌তে আমার অগ্নি—এই অপবিত্রার অগ্নি! ও আদেশ আমাকে দিও না। এই দেখ, যাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিলে, সে আজ এত বড় হয়েচে—এ তোমারি পুত্র!—বলিয়া সুষমা সুলোচনার গর্ভে মহেন্দ্রের ঔরসজাত সেই অমিতাভ সুন্দর বালককে স্বামীর চক্ষে ধরিল!

মহেন্দ্র সেই অনাথ বালকের মুখশ্রীতে তাহারি একটা বিগত দিনের প্রতিবিম্বকে খুঁজিয়া পাইল। ভয়ার্ত্ত অপরাধীর ন্যায় সেই সুকুমার অনাথের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া আর চাহিতে পারিল না। মহেন্দ্রের স্থির বিশ্বাস ছিল, আতুরী সেই সদ্য-ভূমিষ্ঠ জীবন-প্রদীপকে ভোরের আলো দেখিতে দেয় নাই!

—উঃ! এই প্রায়শ্চিত্ত! এর জন্যই কি আমাকে এত পথ অতিক্রম ক'রে আস্‌তে হলো? ভগবান্‌, ভগবান্‌, কি দেখালে! কাকে দেখালে! আর যে এ-দৃশ্য—এ-যাতনা সইতে পারচি না প্রভু!

অনুশোচনার অব্যক্ত যাতনায়—মহেন্দ্রের হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া আসিল—মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়া তাহার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিল—বাক্‌শক্তিও লুপ্ত হইয়া আসিল।

—"বিমল-দা, বিমল-দা, এস, আমার স্বামীকে বাঁচাও!" বলিয়া সুষমা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে মহেন্দ্রের সবই ফুরাইয়া গেল। সুষমারও শেষ রশ্মিটুকু মুছিয়া গেল।

বেলুড়ের গঙ্গা-তীরে সেই জন্ম-অপরাধী অথচ ফুলের মত পবিত্র বালক-সন্ন্যাসী মহেন্দ্রের মুখাগ্নি করিল।

তোমরা দেখতে!—স্বামীর শোকের ব্যথা নারী হ'য়ে আমি সহ্য ক'রে বেঁচে আছি, কিন্তু জানোয়ার বাঁচল না। কুকুরটা মনিবের শোকে কেঁদে কেঁদে দেহত্যাগ করলে!......

এমনি সময় কৈলাস হরে-পাগ্‌লাকে আনিয়া হাজির করিল।

হরে তখন বিরজাকে বলিতেছে—এতদিকে তোমার চোখ থাকে না, অথচ সেই থেকে যে এখানে দাঁড়িয়ে আছ—নিজের বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়াধন ভবেশকে তুমি চিন্‌তে পারোনি! আজ যে তোমার ভবেশের বিয়ে।—বউ দেখেছ?

বিরজা হাসিয়া বলিল—হরে, তুই সত্যি সত্যিই পাগল। মা কি ছেলেকে কখনও ভুলে থাকে, বাবা? ছেলের টানে-টানেই তো আজ এসে পড়লুম। নইলে বউকে বরণ করতো কে?

কৈলাস বলিল—হরে কি বলছে জানো মা,—জামাইবাবুর পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রেছে—জীবনে গাঁজা আর খাবে না! তা ছাড়া এই আশ্রমেই থাকবে।

বিরজা হাসিতে লাগিল।

—কি বাবা হরিচরণ!—সত্যিই সন্ন্যাসীর পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছ?—সাবধান—ভুলেও যেন গাঁজা আর নেড়ো না, মহাপাপ হবে।

হ'রে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল—আমার নাম হ'রে-পাগ্‌লা। গোঁ ধরলে ভগবান্‌কে মানিনে মা!—যখন একবার মুখ থেকে 'না' বেরিয়েছে, তখন 'হাঁ' আর হবে না।

শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল

মঞ্জুশ্রীর মুখচুম্বন করিয়া বাণেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলেন—আয়ুষ্মতি—চিরসধবা হও।

বিরজা বলিল—সাবিত্রী-সমান হও!

সুষমা ও সুলোচনা আশীর্ব্বাদ করিল—স্বামী-অনুগামিনী হও—সুপুত্রের জননী হও।

বিমল সংসারী লোক,—সুশীলকে লইয়া ঘরে ফিরিবার সময় করুণ নেত্রে সুলোচনার পানে চাহিতে চাহিতে বলিল—স্মরণ করলেই আসবো। সুশীলকে তুমি যখন ডাক্‌বে, তখনই ছুটে আসবে—আমি একবারও তাতে বাধা দেব না।

তারপর ভবেশ ও মঞ্জুশ্রীকে সন্ন্যাসীজনোচিত উপহার দিয়া বিমল সপুত্র বিদায় গ্রহণ করিল।

বিরজা সেদিন সমস্তক্ষণ পুত্র-পুত্রবধূকে কাছে-কাছে রাখিল।

কয়েকবার বুড়া কৈলাস আসিয়া পরিহাস করিয়াছিল—মা যে আমার আজ থেকে পুরোমাত্রায় সংসারী হ'য়ে পড়লে।—মহামায়া-মাকে একবার দেখ,—বেচারী দিনরাত খেটে খেটে গেল যে!

বিরজা কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করিল না। বিপুল মমতার সহিত পুনঃ পুনঃ পুত্র-পুত্রবধূকেই দেখিতে লাগিল।

ভোরেরর পাখী বন্দনা-গান সুরু করিয়াছে! সন্ন্যাসীর সংসারেও ভগবৎ-গীতির সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

এমনি সময় জাহ্নবীর পবিত্র জলে সদ্যস্নাত সন্ন্যাসী বাণেশ্বর গীতার

ত্যাগমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অনির্দ্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটিয়াছেন। সঙ্গে তাঁর বিরজা।

মহাপুরুষ—সেই জগদ্‌গুরু সন্ন্যাসীর যমজ সন্তান বাণেশ্বর ও বিরজা, পুত্র এবং কন্যা।

আজ তাহারা দীর্ঘ বিরহের পর সংসারের লীলাবসানে পুনরায় পিতৃ-চরণ সন্দর্শনে ছুটিয়াছে—ব্যগ্র তন্ময়তা লইয়া।—বিশ্রামের নাই অবসর, আহার নিদ্রার নাই চিন্তা,—লক্ষ্য শুধু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপরিম্লান লাবণ্যের দিকে।

শেষ